ঘেরা
মাঠ
ছড়ানো
গ্যালারী
অমল দত্ত

ঘেরা মাঠ ছড়ানো গ্যালারী

অমল দত্ত

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশক:
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৯

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরনী
কলিকাতা-৯

ঘেরা মাঠ
ছড়ানো গ্যালারী

প্রত্যেক সৎ মানুষেরই—তার সমকালের কাছে, তার চিন্তার ও কর্মের জবাব দিহির একটা বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব আছে।

ফুটবল-কোচও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

ঘেরা মাঠ-ছড়ানো গ্যালারী তারই স্বাক্ষর।

অমল দত্ত

৺সুনীল মল্লিককে

আন্তঃ রাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতার স্মৃতি-নিদর্শনের উপর যে কেউ একনজরে তাকালেই বাঙলার অভ্রান্ত কৃতিত্বের অনস্বীকার্যতা বুঝতে পারবেন। আর তিনি যদি বাঙালী হন—গর্বে বুক ফুলে উঠলেও তাতে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু কেবলমাত্র সন্তোষ ট্রফিতে কৃতিত্বের এই উজ্জ্বল স্বাক্ষরটুকু দিয়েই ভারতীয় ফুটবলে বাঙলার অবদানের ব্যাপ্তির পরিমাণ করতে গেলে নিঃসন্দেহে আমাদের ঠকতে হবে। কেননা ইতিহাস আরও কিছু বলে।

যে কোন খেলা, যে কোন দেশে জনপ্রিয় হতে হলে—প্রথমেই চাই সেই খেলার অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রয়োজনীয় অর্থ-নৈতিক স্বচ্ছলতা এবং সেই সঙ্গে অতি অবশ্যই চাই সেই দেশবাসীর খেলাকে গ্রহনের জন্য ঐতিহ্যপুষ্ট মানসিকতা।

ক্রিকেট, হকি বা বাস্কেটের মতই ফুটবলও ভারতে এসেছে বিদেশ থেকে আমদানী হয়ে। উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ রনতরীর সঙ্গে সঙ্গে ভিড়তো সওদাগরী তরী—পৃথিবীর নানান্ বন্দরে। সেই সব জাহাজে থাকতো ব্যবসাদার, রাজকর্মচারী, সৈন্য আর নাবিকের দল। বিদেশে খেলাধুলো করে সময় কাটানোর জন্য এদের দরকার হত ফুটবল আর একটুকরো সমতল জমি, তা যে কোন জায়গায় এবং যে কোন আবহাওয়ায় হোক না কেন। আর সেইসব দেশের অধিবাসীরা প্রথমে অবাক হয়ে দেখতো ইংরেজদের এই খেলা। আস্তে আস্তে তারা এ থেকে আনন্দও পেতে সুরু করলো। তারপর একটু সাহস করে ইংরেজদের সঙ্গে খেলতেও সুরু করে দিল।

এমনি করেই ফুটবল খেলা ছড়িয়ে পড়লো ল্যাটিন আমেরিকার

কফির বাগান হয়ে মালয়েশিয়ার রাবারের জঙ্গল পর্যন্ত। ভারতবর্ষের ফুটবলও এর ভিতরে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখান থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সেই বেলুচিস্তান, পেশোয়ার, কোয়েটা থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যের জল ছুঁই ছুঁই শেষ সীমান্ত মালাবার পর্যন্ত যেখানেই ব্রিটিশ মিলিটারির ঘাঁটি ছিল—সেখানেই ফুটবল খেলা জনপ্রিয় হয়ে গেছে।

বেশীর ভাগ দেশীয় ছেলেরা সেদিন এই খেলা শুধু দূর থেকে দেখেছে। মাত্র কয়েকটি দুঃসাহসী ছেলে খালি এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে খেলেছে। মাঝে মাঝে সৌজন্যমূলক দুচারটে ম্যাচও যে এদের ভিতর খেলা হয় নি এমন নয়। কিন্তু প্রতিদ্বন্দিতামূলক ম্যাচে দেশীয় ছেলেদের যোগদান করতে সময় লেগেছে পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি।

বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই দেখতে পাই, এই কলকাতার গড়ের মাঠে গোরা মিলিটারি টিম, সিভিলিয়ান সাহেবদের টিম আর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের পাঁচটা টিমের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আসরে নেমেছে পুরোপুরি বাঙালী ছেলে নিয়ে গঠিত দুটি টিম—মোহনবাগান ও এরিয়ান্স। সেদিনের বুটপরা বিরাট বিরাট ষণ্ডামার্কা চেহারার গোরাদের কাছে লিকলিকে খালিপায়ের বাঙালী ফুটবলারদের চেহারাগুলো আজকে হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্যামেরার লেন্সে সেইসব খেলোয়াড়েদের মনের ছবিটাতো আর ধরা পড়ে নি! ধরা পড়লে দেখা যেত পথিকৃত হতে হলে যে দুর্জয় সাহস ও কল্পনা-প্রবন মনের একান্ত দরকার তা তাদের মধ্যে ছিল; এবং তারই ফলশ্রুতি—১৯১১ সালে মোহনবাগানের আই. এফ. এ শীল্ড জয়।

আজকের অনেক বাঙালী ফুটবলার ও ক্রীড়া-সমালোচকরা যদিও সেই ঐতিহাসিক বিজয়কে সমালোচনা করে বলেন—ওটা 'ফ্লুক' অর্থাৎ কাকতালীয় নতুবা ১৯১১ সালের পর থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত কোন দেশীয় টীম আই. এফ. এ. শীল্ডে আর জিততে পারল না কেন?

এর উত্তরে প্রবীন খেলোয়াড়রা বলেন—এ কথা বলি না যে মিলিটারি অথবা ক্যালকাটা ক্লাবের চেয়েও ভালো খেলতাম বলেই আমরা আই. এফ. এ শীল্ড পেয়েছি, বরঞ্চ উল্টো। গোরা খেলোয়াড়রা শারীরিক ফিট্‌নেসে, ক্রীড়া-দক্ষতায় ও বুটের সুযোগ পাওয়ায়—নিঃসন্দেহে আমাদের চেয়েও অনেক উঁচুদরের খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক খেলায় নিষ্ঠা ও উদ্যমের পুরস্কার আছেই। কোন না কোন সময়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার দিকে ফিরে তাকাবেই। তার আর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ—লীগের দ্বিতীয় ডিভিসনের টিম কুমারটুলি ক্লাবের ১৯২৪ সালের আই. এফ. এ শীল্ডের ফাইনালে পৌছান। এ ছাড়াও তখনকার ভারতীয় একাদশ ৫।৬ বার ইয়োরোপীয়ান একাদশকে হারিয়েছে এগুলো নিশ্চয় 'ফ্লুক' নয় ?

এইসব চাপান—উতরোনকে পাশ কাটিয়ে আমরা অনায়াসে একটা সত্যকে মেনে নিতে পারি যে ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়—ভারতীয়দের মনে শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার প্রেরণা ও উদ্যমই জোগায়নি এর আগে ভারতীয় ফুটবলারদের মনে নিজেদের সম্বন্ধে যে হীনমন্যভাবোধ ছিল তা কাটিয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ এক নতুন আত্মপ্রত্যয় তৈরী করেছিল, যা এর আগে কোন ভারতীয় টিমই তৈরী করতে সক্ষম হয় নি। ভারতীয় ফুটবলে বাঙলার এর চেয়ে বড় অবদান আর কিছুই নেই।

১৯১৫ থেকে '৩০-এর মধ্যে বাঙলার ফুটবলে আর এক স্মরনীয় নাম—ভারতীয় ফুটবল কোচিং-এর পথিকৃত দুখীরাম মজুমদার।

ইতিহাসে দেখা যায় কিছু কিছু লোক আছেন যারা তার কালের আগেই জন্মেছেন। যেমন পরিবেশ তৈরী নেই অথচ প্রতিভা তার স্বকীয় সত্তার নিয়ে হাজির এবং যথারীতি সমসাময়িক নিষ্ঠুর কালের উদাসীনতায় সেই প্রতিভার ভগ্নহৃদয়ে মহাপ্রস্থান। দুখীরাম মজুমদারের ক্ষেত্রেও অবশ্য তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তার নিজের হাতে গড়া—সেইসব ভারতখ্যাত ফুটবলারদের নামগুলো আজও

হয়ত ভারতীয়-ক্রীড়ামোদীদের স্মৃতির জগৎ থেকে একেবারে মুছে যায়নি; কিন্তু তবুও আজ মনে হয় সেদিনের ফুটবলাররা এবং ফুটবলের কর্মকর্তারা সবচেয়ে বড় অপরাধ করেছেন দুখীরামবাবুর বারবার বলা একটা উপদেশকে অগ্রাহ্য করে ; এবং যার ফলে ভারতীয় ফুটবলে বাঙলার যে অন্যতম প্রধান অবদানটুকু ভারতীয় ফুটবলকে আধুনিক ও গতিশীল করে তুলতে পারত—তা না হওয়ায় ভারতীয় ফুটবল পঞ্চাশ বছরেরও উপর পেছিয়ে গেছে।

দুখীরামবাবুর কাছে যখনই যে কোন ফুটবলার খেলা শিখতে গেছে, তাকেই তিনি অনুরোধ করে বলেছেন "বাবা, বুট পরে খেলতে শেখ। বুটপরে খেলতে না পারলে কোনদিনই গোরাদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে না। ভেব না এটা সাহেবিয়ানা। বুটটা আসলে হাতিয়ার। যুদ্ধে যেমন উপযুক্ত হাতিয়ার না থাকলে শত্রুর মোকা-বিলা করা যায় না খেলাতেও তাই। বুট পরে খেললে তোমাদের বল-কণ্ট্রোল, ট্র্যাপিং, ট্যাক্‌লিঙ, স্ম্যাটিং—সবকিছুতেই উন্নত হবে। নির্ভয়ে গোরাদের সঙ্গে ভীড়তে পারবে। পায়ে চোট লাগার সম্ভাবনা থাকবে না। আর বর্ষার মাঠেও গোরাদের হারাতে পারবে। দেখছ না লীগের শুকনো খটখটে মাঠে যে টিমকে তোমরা ৫।৬ গোলে হারাচ্ছ, শীল্ডের বৃষ্টি-কাদার মাঠে সেই টিমই তোমাদের চার গোল ঠুকছে।"

ভাইপো ছোনে মজুমদার ছাড়া দুখীরামবাবুর সেদিনের সেই উপদেশ কেউ নেয়নি। বুট পরে খেললে পাছে গতি কমে যায় ও শারীরিক ধকল বেশী লাগে সেই ভয়ে সব ভারতীয় ফুটবলাররাই বুট পরাকে এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু তা যদি না হতো।

ভারতীয় ফুটবল দক্ষতার দিক থেকে আজ নিশ্চয় এত অপটু থাকতো না। বুট তাকে এত আড়ষ্ট করে দিত না। এতদিনে ভারতীয় ফুটবল নিশ্চয়ই তার নিজস্ব ষ্টাইল খুঁজে পেত বা তৈরী করে নিত। এ কথাটা আরও বিশেষ করে মনে পড়ে যখন দেখি—ত্রিশ বছরের

ভারতীয় ফুটবলাররা নিখিল ভারত ট্রেনিং ক্যাম্প কোচের কাছে কিকিং অথবা বলকে ইনসাইড-আউটসাইড করা শিখছে।

এ বিষয়ে ভাবতে আজও কেমন আশ্চর্য লাগে যে উৎকট সাহেব হবার সেই সাহেবীয়ানার যুগে, বাঙালী যখন অন্য প্রদেশের তুলনায় সবচেয়ে আগে ইংরাজীয়ানাকে আত্মসাৎ করে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে তখন সাহেবদের শেখানো এই ফুটবল খেলাটাকে সাহেবী ধরনেইবা তা তারা রপ্ত করলো না কেন?

ক্রিকেটের বেলায় কই সে তো সাহেদের সঙ্গে খালিপায়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে ক্রিকেট খেলতে যায়নি?

১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতীয় ফুটবলারদের বুট্ পরে খেলা বাধ্যতামূলক করে নিখিল ভারত ফুটবল সংস্থা বাঙলার এই ফাঁকির আজ প্রায়শ্চিত্ত করছে।

এ প্রবন্ধ পড়তে পড়তে পাঠকের স্বভাবতই মনে হতে পারে যে ভারতীয় ফুটবলের নিজস্ব সত্তার কোন বৈশিষ্ট ছিল কি—যার জন্য ভারতীয় ফুটবলে বাঙলার অবদানের প্রশ্নটা উঠবে?

১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত অবশ্য এ প্রশ্নটা ওঠেই না। কেননা নিখিল ভারত ফুটবল সংস্থা তখনও গড়েই ওঠেনি। সেই তুলনায় ১৮৯৩ সালে বাঙলার ফুটবল সংস্থা আই. এফ এ-র সৃষ্টি হয়।

ভারতের ফুটবল সংস্থাগুলির ভিতর সবচেয়ে প্রাচীনতম সংস্থা আই. এফ. এ—এ বিষয়ে পথিকৃত হবার গর্ব করতে পারে।

প্রতি বছর কলকাতায় ভারতীয় একাদশ বনাম ইয়োরোপীয়ান একাদশের যে খেলাটি হতো ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তাতে যোগদান করতে দেখা যেত কেবলমাত্র কলকাতার খেলোয়াড়দেরই।

১৯২৬ সালে রেঞ্জার্স ক্লাবের মিঃ রসার জাভাতে যে ফুটবল টিম নিয়ে যান সে টিমের সব খেলোয়াড়রাই ছিল কলকাতার। এরপর ১৯২৯ সালে আই. এফ. এ যে টিম নিয়ে জাভাতে আবার প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে যায় তার খোলোয়াড়রাও ছিল কলকাতার।

১৯৩৩ সালে আই. এফ. এ খেলতে যায় কলম্বো। অধিনায়ক ছিলেন গোষ্ঠ পাল। এই প্রথম আই. এফ. এ-র টিমে একজন বাঙলার বাইরের খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হয়—তিনি হলেন ফৈজাবাদের নুরমহম্মদ।

১৯৩৬ সালে ডাঃ মন্মথ দত্তের অধিনায়কত্বে ভারতীয় একাদশ দক্ষিণ আফ্রিকা খেলতে গেল তখনও সে টিমে বাঙলার বাইরের খেলোয়াড় ছিল মাত্র চারজন। তারা হলেন রমানা, লক্ষ্মীনারায়ণ, অখিল আমেদ এবং মহম্মদ হোসেন।

এই উদাহরণগুলো উল্লেখ করে আমি অবশ্যই প্রমাণ করতে চাই না যে সারা ভারতে বাঙলা ছাড়া আর কোথাও ফুটবল খেলা হতো না বা হলেও সেখানকার খেলার মান ছিল অতিশয় নীচু। দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার, উত্তর ভারতের কানপুর, ফৈজাবাদ এবং দক্ষিণ ভারতে ফুটবলের বিশেষ চর্চা ছিল। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোরে ফুটবলের মান তখন এতই উন্নত ছিল যে বাঙলার সম্মিলিত দলও সেখানে খেলে কোন ম্যাচই জিততে পারে নি; এবং ব্যাঙ্গালোর যে প্রচুর ভারত খ্যাত ফুটবলার উপহার দিয়েছে তা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়।

আসলে আমার বলার উদ্দেশ্য যে বাঙলার টিম মোহনবাগান, এরিয়ান্স, ই. বি. আর এবং বাঙলার ফুটবলার শিবদাস-বিজয়দাস-ভাদুড়ী, গোষ্ঠপাল, সামাদ, কুমার, সূর্য চক্রবর্তী, ছোনে মজুমদার, মতিয়ার রহমান, বলাই চ্যাটার্জী, বাঘা সোম, মনি তালুকদার, পূর্ণ দাস, শরৎ সিংহ, রবি গাঙ্গুলী, করুণা ভট্টাচার্য, প্রমুখ খেলোয়াড়গণ তখন সারা ভারতের যথাক্রমে প্রতীক-টিম ও প্রতীক

ফুটবলার হিসেবে স্বীকৃতি তো পেয়েছিলেনই, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রণও পেয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজ-কর্মচারীদের কাছ থেকে ডুরাণ্ড ফুটবলে যোগদান করার।

এর আগে পর্যন্ত কোন দেশীয় টিমকেই ডুরাণ্ডে খেলার জন্য নেওয়া হয়নি। প্রতিযোগিতার দাবী নিয়ে এগিয়ে এলো প্রথমে এই কলকাতারই তিনটে টিম—মোহনবাগান, এরিয়ান্স ও ই. বি. আর। এর ভিতর ই. বি. আরই একমাত্র দল-যারা আসলে ডুরাণ্ড কাপের ফাইনালে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল।

উপরোক্ত বাঙলার স্মরনীয় ফুটবলারদের জন্যই যে ভারতীয় ফুটবল তার আঁতুর ঘরের অসহায়তা থেকে কৈশোরের বলিষ্ঠতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল—এ সত্য সর্বজন স্বীকৃত।

কিন্তু এরই ভিতর থেকে কতকগুলো খেলোয়াড়ের নাম হারিয়ে গেছে। হয়ত হারিয়ে যায় নি, আমরাই ইচ্ছা করে উল্লেখ করতে ভুলে যাই। ভারতীয় হকির স্বর্ণ যুগের কথা আজ উঠলেই, ধ্যানচাঁদ আর রূপসিং-এর কথাই খালি ওঠে; কই ট্যাপসেল, গ্যালিবারডির মত দুর্দান্ত খেলোয়াড়দের ত আমরা স্মরণে আনি না! তাদের অবদান কি ভারতীয় হকিতে ধ্যানচাঁদ আর রূপসিং-এর চেয়ে কিছু কম ছিল?

এর কারণ নিশ্চয় আমাদের মানসিক বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষের যথেষ্ট কারণও রয়েছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় কোনদিনই বিশেষ করে পরাধীনতার যুগে নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করে নি। তবু তারা আমাদের সঙ্গে একই টিমে কিংবা নিজেদের সম্প্রদায়ের টিমের হয়ে বিভিন্ন খেলায় ও স্পোর্টসে যোগদান করেছে। এমন কি অলিম্পিকেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে। কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি তাদের উপচে পড়া ঘৃনা, মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের উভয়কে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

তবু কৃতঘ্নতা অপরাধ—সত্য বোধ কৃতজ্ঞতারই জন্ম দেয়।

সেদিনের কলকাতার প্রথম ডিভিসনের দশটা টিমের ভিতর পাঁচটি টিম ড্যালহৌসি, কাষ্টমস্, রেঞ্জার্স, পুলিস ও ই. বি. রেলওয়ের অধিকাংশ খেলোয়াড়রাই ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান; এবং এই খেলোয়াড়রা তাদের প্রাণবন্ত খেলার দ্বারা তখনকার কলকাতার লীগকে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক লীগ্-অনুষ্ঠান রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফুটু ডি সিলভা, লরি কার, ডিকি কার, গ্যালব্রেথ, কার্ভে ভ্রাতৃদ্বয়, ম্যাকগোয়ার, জে. লামসডেন, আর. লামসডেন প্রভৃতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ফুটবলাররা নিঃসন্দেহে তখনকার ভারতের পয়লাসারীরই খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯৩১-৩২ সালে কালিঘাটের প্রথম ডিভিসনের ওঠার পর থেকেই বাঙলার ফুটবল একটা নতুন দিকে মোড় নিল। এর আগেও যে বাঙলার বাইরের ফুটবলাররা এখানকার ক্লাবের হয়ে খেলেননি তা নয়—সামাদ, মতিয়ার রহমান এসেছিলেন পুর্ণিয়া থেকে; মোহনবাগান এ্যাটলীকে এনেছিল মাদ্রাজ থেকে কিন্তু কালিঘাটের মত বাইরে থেকে পাইকারি হারে ফুটবলার কলকাতার আর কোন ক্লাব আনায়নি।

জন, জোসেফ, আপ্পারাও, বাবু, মিরজা, কাইজার, অখিল আমেদ, সাবু, রামালু ডিলাটেক ও পাগস্লে কালিঘাটে যোগদান করাতে কলকাতার ফুটবল তার আঞ্চলিকতার ঘোমটা সরিয়ে একটা সর্বভারতীয় রূপ নিতে সুরু করলো!

টিমের ভিতর শুধু যে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মিলন হলো তাই নয়—খেলার আঙ্গিকের ভিতরও বিভিন্ন ঘরানার মিলনে বাঙলার ফুটবল নতুন একটা রূপ নিতে সুরু করলো। সেদিন দাক্ষিণাত্যের ঘরানার

ছাপটাই বেশী করে বাঙলার ফুটবলের উপর পড়েছিল। এতদিন বাঙলার ফুটবলে ছিল লম্বা লম্বা পাসের সাহায্যে খেলার মূল প্রচেষ্টা। সেই সঙ্গে বিপক্ষের দুটো ব্যাকের মাঝখান দিয়ে নিজেদের ফরোয়ার্ডদের উদ্দেশ্যে থ্রু পাস বাড়ানো। উইঙ্গারদের একটি মাত্র কর্তব্য ছিল বল পেলেই তীব্রগতিতে কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে দৌড়নো ও সেখানে পৌঁছে উঁচু করে বিপক্ষের পোষ্টের মাঝখানে বলকে সেণ্টার করা এবং ডিফেণ্ডাররা কোন রকম বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে বলকে এলোপাথারি মেরে বিপক্ষের দিকে কিংবা মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিত।

ড্রিবলিং যে খেলার ভিতর ছিল না তা নয়; তবে তা মূল খেলার গতিকে ব্যাহত করতো না বা আধিক্য দোষে দুষ্ট হতো না।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ফুটবল আঙ্গিক ছিল ভিন্ন। বলকে অযথা না তুলে বা এলোপাথারি না মেরে ছোট ছোট মাটি ঘেঁষা স্কোয়ার পাশের বহুল প্রয়োগ, ড্রিবলের আধিক্য এবং ড্রিবলের সময় পায়ের চেটোর অসাধারণ প্রয়োগ এবং বলের ওপর অস্বাভাবিক কণ্ট্রোল-দাক্ষিণাত্যের ফুটবলকে একটা অনন্য ঘরানায় রূপান্তরিত করেছিল।

শীঘ্রই ১৯৩৬ সালে বিভিন্ন প্রদেশের খেলোয়াড় ও ঘরানার সংমিশ্রনে এক আশ্চর্য রূপান্তর দেখলো ভারতবাসী—কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রীড়াশৈলীর মধ্য দিয়ে। এতদিন তারা অভ্যস্ত ছিল ব্যক্তিক ক্রীড়াশৈলী বা ক্রীড়া—চাতুর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে তা বাঙলার বা ভারতের যে কোন ফুটবলারের ক্ষেত্রেই হোক না কেন, মহামেডান স্পোর্টিং এর খেলা সমস্ত পুরনো ধারনাকে ভাসিয়ে দিয়ে নিয়ে এলো নয়া ধারনার জোয়ার।

ফুটবল যে একার খেলা নয়—দলের এগারো জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার যোগফল; খেলায় এর সফল প্রয়োগের জন্য যে সুস্বাস্থ্য ও নির্ভীক মনের অধিকারী হতে হয় ও সেইসঙ্গে নিয়মিত প্রচণ্ড অনুশীলনের দরকার—তা আমরা দেখতে পেলাম এই প্রথম ভারতীয় টীম

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এর মাধ্যমে। সেইসঙ্গে দেখতে পেলাম সারা খেলায় বিপক্ষের গোলে বল ঢুকিয়ে দেবার সামান্যতম সুযোগ-টুকুরও অপচয় না করা। সফলকামী টিম হতে হলে এই গুণ বিশ্বের যে কোন দেশের যে কোন টিমের থাকা প্রাথমিক প্রয়োজন।

পর পর পাঁচবার কলকাতার লীগ-বিজয় (যে রেকর্ড আজও কোন টিম ভাঙতে পারেনি) ভারতের সমস্ত বড় ট্রফি ঘরে তোলা, যে কোন গোরা টিমকে হারানো এবং সেইসঙ্গে সারা ভারতে সকলের মুখে মুখে মহামেডান স্পোর্টিং-এর—ওসমান, জুম্মা, বাচ্চি, মাসুম, নুর, রহিম, রসিদ, রহমৎ, হাবিব, মহিউদ্দীন প্রভৃতি খেলোয়াড়দের উচ্চারিত নামগুলো কালের নিয়মেই আস্তে আস্তে একদিন মুছে গেছে বা যাবে। কিন্তু মুছবে না আধুনিক ফুটবলের জন্মদাতা ও আধুনিক ফুটবল-ক্রীড়ারীতির সফল প্রয়োগে—ভারতীয় ফুটবলে বাঙলার এই টীমটির অবিস্মরণীয় দানের কথা।

সেদিন যদি অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল যোগদান করত—তাহলে নিশ্চয়ই এই দলের এগার জনকেই সেই দলে নিতে হত।

মনে পড়ে ১৯৫৫ সালের এক বিকেলে ভবানীপুর মাঠের উপর দিয়ে ধর্মতলার ট্রাম গুমটির দিকে দ্রুত হাঁটছিলাম। সামনের দুই বৃদ্ধের আলোচনা কানে যেতেই আমার গতি মন্থর হয়ে গেল।

রাশিয়ার জাতীয় দল সেদিন তাদের শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেললো ভারতীয় ফুটবল একাদশের সঙ্গে এবং জিতলো যথারীতি ৩-০ গোলে। সেই ট্যুরে রাশিয়ান দল গোল করেছিল সাকুল্যে একশোটা; এবং প্রত্যেক ভারতীয় টিমকেই প্রায় কমপক্ষে তিনটি করে গোল করেছিল।

একবৃদ্ধ অপরকে বললেন 'যাই বল খেলা দেখালে বটে রাশিয়ানরা। আমার দেখা যত বাইরের টীম এই কলকাতায় খেলতে এসেছে এই দলটিই তার ভিতর সেরা, তুমি কি বল?'

অপর বৃদ্ধ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। দুই বৃদ্ধ ততক্ষনে

ভবানীপুর মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম বৃদ্ধ আবার ইষৎ বিরক্তসূচক কণ্ঠে বললেন 'তোমার খেলা কেমন লাগল জানি না—তবে অতক্ষন ধরে এই ইঁদুর-বেড়াল ধরা ধরা খেলা আমার সহ্য হচ্ছিল না।'

অপর বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আহা, আজ যদি সেদিনকার মহামেডান স্পোর্টিং টীমটা থাকত তাহলে দেখিয়ে দিত এই রাশিয়ানদের ফুটবল খেলা কাকে বলে। জুম্মা, বাচ্চি, নুর রহমৎ···আহা কি খেলোয়াড়ই সব ছিল! হাফিজ রসিদটাও যদি আজ অন্ততঃ থাকত···তাহলে নিশ্চয় দেখতে একটা গোল সে অবধারিত করতই।"

মহামেডান স্পোর্টিং-এর সাফল্যের পর থেকেই কলকাতার বড় বড় টীমগুলোয় অন্য প্রদেশের খেলোয়াড় এনে নিজের ক্লাবে খেলানোর ধুম পড়ে যায়। কিন্তু এরই ভিতর এসে পড়লো দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ।

কয়েক বছরেব জন্য কলকাতাব ফুটবল প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমরা পেলাম স্বাধীনতা। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় ফুটবল দল সর্বপ্রথম অলিম্পিকে গেল মোহনবাগানের সেন্টার হাফ টি· আও-এর অধিনায়কত্বে।

১৯৪৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবল দলে বাঙলার ফুটবলারদের সংখ্যা থাকছে বরাবর অর্ধেকেরও ওপর। কেবলমাত্র এই সংখ্যাটুকু দিয়েই আজকের ভারতীয় ফুটবলে বাঙলার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ভূমিকা ধরা পড়বে না। ১৯৪৮ সালের পর থেকেই কলকাতার বিভিন্ন ক্লাব বিশেষ করে ইষ্টবেঙ্গল, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, পাকিস্তান এবং কলম্বো থেকেও খেলোয়াড় আনিয়েছে।

বাঙলা তখন থেকেই ভারতীয় ফুটবলের নারসারীরূপে গণ্য হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই উঠতি ফুটবলাররা স্বপ্ন দেখেছে—কলকাতায় ফুটবল খেলার। তাই কলকাতার কোন ক্লাবের ডাক পেলেই কালবিলম্ব না করে তারা এসে আশ্রয় নিয়েছে—বাঙলা ফুটবলের পক্ষচ্ছায়ায়। ব্যতিক্রম অন্ধ্র পুলিসের কিছু প্রখ্যাত ফুটবলার।

তাজমহম্মদ, টি. আও, বচন, মহাবীর, ভেঙ্কটেশ, আমেদ, সাত্তার, ধনরাজ, সালে, কিট্টু, চন্দন সিং, গোকুল, রহমান, বলরাম, জার্নাল সিং, অরুময়, থঙ্গরাজ, প্রসাদ, নয়িম, হাবিব, শ্যাম থাপা, আলতাফ প্রভৃতি সর্বভারতীয় ফুটবলারদের নামের সঙ্গে শৈলেন মান্না, ব্যোমকেশ বসু, লতিফ, রুনু গুহঠাকুরতা, সমর ব্যানার্জী, সনৎ শেঠ, নিখিল নন্দী, মেওয়ালাল, অরুণ ঘোষ, প্রশান্ত সিংহ, প্রদীপ-ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী, সুভাষ ভৌমিক, অসীম মৌলিক, সুকল্যাণ-ঘোষ দস্তিদার, সুধীর কর্মকার, কাজল মুখার্জী প্রভৃতি সর্বভারতীয় বাঙালী ফুটবলারদের যুক্ত করলেই বাঙলার সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের ভিতরের তফাৎটা ক্রমশঃ যে অস্পষ্ট হয়ে পরে নিঃশেষে মুছে গিয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য আর কলম ধরতে হবে না।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুঙ প্রমাণ করেছেন—আমরা পাঁচটি নয় ছয়টি ইন্দ্রিয় নিয়ে জন্মাই। আর এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি হলো আমাদের স্বজাত্যবোধ। তাই স্বজাতের প্রশংসায় গৌরব বোধ করি আবার নিন্দায় করি রাগ। খুব ছোট বেলায় এই বোধটা থাকে আমাদের মনে অপরিণত অবস্থায়। বড় হয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ধরতে শেখে তার জাতি কোন কীর্তিতে গৌরবান্বিত।

প্রত্যেক জাতিরই থাকে কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট গুণ—যার পরিচয়ে তার পরিচয়। যার দ্বারা সে অপর জাতির কাছে বিশেষভাবে চিহ্নিত। বাঙলাও তেমনি তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই ফুটবল প্রিয়তার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত।

একজন বাঙালী—সে ফুটবলার হোক বা না হোক অথচ সে ফুটবল রসিক নয় একথা ভারতের কোন প্রদেশবাসীই বিশ্বাস করে না। ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর কাছ থেকে বর্তমানে এইটাই বোধকরি বাঙালীর পাওয়া একটা শ্রেষ্ঠ কম্‌প্লিমেণ্ট।

বাঙালার তরফ থেকে এই বোধ সে বহুদিন ধরে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীকে দেবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তুলনামূলকভাবে সাড়া মিলেছে খুবই অল্প।

বাঙলা তাদের বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেছে জনপ্রিয়তাই যে কোন খেলার মেরুদণ্ড। যাকে অবলম্বন করে সে নিজে বাঁচে তারপর তার আয়তনকে দীর্ঘ করে। অন্য কারণগুলো শরীরের হাত পা। কিন্তু বাঙলার এই অবদান ভারতীয় ফুটবলের দরজায় আজও নীরবে অপেক্ষমান।

ভুল করা ও ক্রমশঃ ভুল শুধরে নেওয়ার পথ ধরেই শিক্ষার্থী আস্তে আস্তে নিখুঁত হয়ে ওঠে। শিক্ষা-মনস্তত্বে একেই বলা হয় ট্রায়াল অ্যানড্ এরার মেথড। এই পদ্ধতি যে কোন শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেই মূল প্রয়োগসিদ্ধ রীতি। ফুটবল খেলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

এ দেশের অনেক ক্রীড়ামোদীর ধারণা কেবলমাত্র অনুশীলনের (ফুটবল মরশুমের আগে অথবা চলাকালীন, গড়ের মাঠের বিভিন্ন সিনিয়ার ক্লাবে সকালবেলায় যে অনুশীলনটুকু হয়) মাধ্যমেই ফুট-বলের মানোন্নতি নির্ভরশীল। কিন্তু তা নয়। অনুশীলনের মাধ্যমে ফুটবলার যা শিখছে বা অভ্যাস করছে খেলায় তার সার্থক প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অনুশীলন মূল্যহীণ।

কিছু কিছু খোলোয়াড়কে অনুশীলনের সময় এত নিখুঁত খেলতে দেখেছি আশা হয়েছিল ভবিষ্যতে এরা প্রথিতযশা খেলোয়াড় হবে। কিন্তু ম্যাচে তারা সবাইকে নিরাশ করেছে।

পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষা-ব্যবস্থা যেমন সম্ভব নয় ম্যাচ ছাড়া ফুট-বলারের সদগুণ বিচারও তেমনি অসম্ভব। তাই লীগ শেষ হবার পর শীল্ড খেলানোর ব্যবস্থা। অর্থাৎ লীগের খেলায় প্রতিটি দলকে প্রতিটি দলের বিরুদ্ধে দুটি করে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়—যার দ্বারা প্রত্যেকেই নিজেদের ভুল ত্রুটি শুধরে সর্বশক্তি নিয়ে শীল্ড জয়ের জন্য প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। কেননা শীল্ড খেলায় একবার হারলে আর দ্বিতীয়বার সুযোগ পাওয়া যায় না। শীল্ড যদি মন্দির হয় লীগ সেই মন্দিরে পৌঁছনোর পথ। লীগ ও শীল্ড তাই এক অন্যের পরিপূরক। এই ব্যবস্থার আর একটি সুফল—ফুটবলারদের

চরিত্রে লড়ার উদ্যম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; এবং এই উদ্যমই খেলার মানকে পড়তে না দিয়ে উপর দিকে টেনে রাখে।

পৃথিবীর সর্বদেশের অনুসৃত এই অবিসংবাদী পদ্ধতিকে অস্বীকার করলে ফুটবল খেলার মান যে কোথায় তলিয়ে যেতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—বর্তমান কলকাতার ফুটবল। ১৯৫৭-৫৮ সালের পর থেকে আই. এফ. এ-র কর্মকর্তারা লীগে ওঠা নামা বন্ধ করে দিতে সুরু করেন। অবশ্য এই বন্ধ করে দেবার পিছনে যুক্তির অভাব ছিল না। যেমন বুট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে লীগে ওঠা নামা তিন বছর বন্ধ। থার্ড ব্যাক প্রথায় সব টিমকে খেলতে হবে, অতএব তিন বছর আবার ওঠা নামা বন্ধ।

সত্তর মিনিট করে লীগে খেলতে হবে অতএব তিন বছর ওঠা নামা এবং ডাব্‌ল লীগ বন্ধ করে একটা করে লীগ খেলা হোক। রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা দেশের খুবই খারাপ—ক্লাবগুলো টিম করতে পারবে না অতএব আবার সিঙ্গল লীগ চালু করে ওঠা নামা বন্ধ।

লীগে ওঠা নামা বন্ধ করে দেবার যুক্তিগুলো যে একেবারেই ছেঁদো—আসলে আই. এফ. এ-র কতকগুলো প্রভাবশালী কর্মকর্তা—যাঁরা একই সঙ্গে কতকগুলি ফার্স্ট ডিভিসন ক্লাবের কর্মকর্তাও বটে, তাদের নিজ নিজ ক্লাবের খরচ কমাতে ও দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যাবার ভয়কে এড়াতে (বড় বড় ক্লাবগুলির অবশ্যই নীরব সহায়তায়) যে এসব করছে—তা সব ক্রীড়ামোদীই জানেন। তবে লীগ নামক সুস্থ শরীরটার ওপর অকারণে বারবার ছুরি চালালে প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে শরীরটা যে একদিন শুকিয়ে মুমূর্ষু হবে এই সত্যটাই তারা জানতেন না।

১৯৫৭-র ভারতীয় দলের ম্যানেজার মিঃ ভিট্টল মারডেকোতে ভারতের শোচনীয় হারের কারণ দেখাতে গিয়ে বলেছেন—ইনদোনেশিয়া, হংকং, বারমা ও জাপানের কাছে পরাজয় ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ড্র করে বারোটা দলের ভিতর ভারতের দশম স্থান করার মূলে

রয়েছে খেলোয়াড়দের আঘাত ও কর্দমাক্ত মাঠ। বারমার কাছে ৯-১ গোলে হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন—এ জাতীয় জঘন্য কাদা মাঠে আমাদের ছেলেরা খেলতে অভ্যস্ত নয়।

এই জাতীয় ছেলে ভুলোনো ছড়া যে আমাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হবে তা জানতাম।

মনে পড়ে ১৯৫৪ সালে ফিলিপাইনসের এশিয়ান গেমসে, ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৪-০ গোলে হেরে আমরা যখন দম দম এয়ার-পোর্টে নামলাম তখন রিপোর্টারদের কাছে ভারতীয় দলের অধিনায়ক শ্রীশৈলেন মান্না বিবৃতি দিয়েছিলেন—ফ্লাড লাইটে খেলতে অভ্যস্ত নই বলেই হেরে গেলাম।

আসলে ট্রেনিং ক্যাম্পে চার পাঁচজন ছাড়া কোন খেলোয়াড়দের যোগ না দেওয়া, যোগ্য খেলোয়াড় দল থেকে বাদ এবং অধিনায়ক ও কোচের নিজেদের ক্লাবের স্বার্থে মারাত্মক চোট খাওয়া খেলোয়াড় কিট্টুকে কোকেন ইনজেকশন দিয়ে খেলাতে গিয়ে, ভারতীয় দলের গোটা খেলাটাই দশজনে খেলা—পরাজয়ের এই প্রধান কারণগুলোত তিনি সেদিন বেমালুম চেপে গিয়েছিলেনই—সেই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল কর্মকর্তা ও জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন—যুগোশ্লাভ কোচের অধীনে ইন্দোনেশিয়া দলের সুদীর্ঘ তিন বছর কঠোর প্রস্তুতির কথা।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ফুটবলারের চোট লাগা স্বাভাবিক কিন্তু সে চোট যে কারোর মারাত্মক হয়নি (যেমন হাড় ভাঙ্গা, লিগামেণ্ট ছেঁড়া অথবা ড্যামেজড্ কার্টিলেজ) তা দেশে ফেরার পথে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় দলের ট্রফিজয় ও ভারতে ফিরে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কোচিং ক্যাম্পে যোগদান ও যথারীতি রাশিয়া ভ্রমণই প্রমাণ করে এবং টিমে এই কারণে ষোলোজন খেলোয়াড় নেওয়াও হয়েছিল।

বর্ষায় কলকাতার মাঠগুলোতে যে কর্দমাক্ত অবস্থা হয় এবং এইসব মাঠেই ভারতীয় দলের দশজন ফুটবলার বছরের পর বছর খেলতে অভ্যস্ত।

শ্রীভিট্টলের উচিত ছিল বর্ষায় এইসব মাঠগুলো পরিদর্শন করে তবেই বিবৃতি দেওয়া। আর যদি মাঠ খুবই কর্দমাক্ত থাকে তবে অসুবিধা হয়েছিল দুই পক্ষেরই।

শুধু ভারতীয়দেরই হয়নি নিশ্চয়।

আসলে ভারতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা এশিয়ার অন্য দেশগুলির প্রস্তুতির কোন খবরই রাখেন না, রাখলে যে বারমাকে ভারতীয় দল ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ সালে যথাক্রমে ৩-০ ও ৫-১ গোলে হারিয়েছিল সেই বারমাই কিভাবে আজ আমাদের গো-হারান হারাচ্ছে। সে কাহিনী প্রথমেই বলতেন—মিথ্যা দিয়ে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের ধোঁকা দিতেন না। সেইসঙ্গে ভারতীয় কর্মকর্তারা খবর রাখেন না ভারতীয় ফুটবল দলের শক্তির উৎসটা কোথায়।

ভারতীয় ফুটবল দলে বরাবরই বাঙলার ফুটবলারদেরই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ভারতীয় ফুটবলের গৌরবোজ্জ্বল দিনে রহিম সাহেবের প্রথম টিমেও বাঙলার খেলোয়াড় ছিল ১১ জনের ভিতর ৭ জন। বর্তমানের ভারতীয় দলে ১৬ : ১০। কাজেই বাঙলাকে যে ভারতীয় ফুটবলের নার্সারী বলা হয় তা মোটেই অত্যুক্তি নয়। তবে এই শিশুপালন কক্ষের শিশুগুলি দিনের পর দিন অযত্ন আর অবহেলায় যে রিকেটগ্রস্ত, সে খবরটা ভারতীয় ফুটবল কর্মকর্তাদের মনে হয় সম্পূর্ণ অজানা। তারা যে যার নিজের স্বার্থ নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, সময় নেই তার ঘরের ছেলেগুলোর খোঁজ খবর রাখার। আর তারা কি জানেন ঐতিহ্যশালী দেশের সম্মান রক্ষার গুরুদায়িত্বের অনেকটাই তাদের কাঁধে চাপানো রয়েছে ?

বারমার কাছে ভারতের ৯-১ গোলে হারার কলঙ্ক আমাদের মুখে এঁকে দেওয়ার জন্য কলকাতার ফুটবল পরিচালকরাও দায়ী। কেননা কলকাতার ফুটবলই ভারতীয় ফুটবল-দেহের হৃদপিণ্ড; এবং দেহ অশক্ত হতে বাধ্য যদি হৃদপিণ্ড দুর্বল হয়।

যে রাজ্যের গভর্ণমেন্ট অথবা ফুটবল সংস্থার তরফ থেকে

খেলোয়াড় গড়বার কোন ব্যবস্থা নেই—যেখানে খেলোয়াড়দের স্রেফ নিজের অদম্য চেষ্টায়, স্বাভাবিক দক্ষতা, মনের ঐকান্তিক জোর ও দিনের পর দিন অশেষ কষ্ট সহ্য করে, গড়ের মাঠের যে কোন তাঁবুতে আশ্রয় করে নিতে হয়—সেই সব উঠতি খেলোয়াড়ী জীবনে ইতি টেনে দেবার অধিকার আই. এফ. এ-কে কে দিল ?

লীগ খেলাগুলিতে নিজেদের দক্ষতা দেখিয়ে যে ভবিষ্যতে বড় খেলোয়াড হবার আশা করে—উঠতি খেলোয়াড়দের সেই একমাত্র আশাটুকু গোড়া থেকে কেটে দিয়ে, আই. এফ. এ কি নিজের সর্বনাশ নিজেই ডাকেননি ?

কলকাতার মাঠের ভাল খেলোয়াড় সৃজনের ক্ষমতাকে বন্ধ্যা করবার জন্য মূলত তারাই দায়ী। কলকাতার মাঠের তিনটি বড় ক্লাব—যাদের খেলোয়াড় নিয়ে আই. এফ. এ সন্তোষ ট্রফি জিতে লাফালাফি করে, সেই তিনটি টিমের কর্মকর্তারাও কি হাতে প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও, জাত খেলোয়াড়ের অভাবে আজ চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন না ?

থঙ্গরাজ, অরুণ ঘোষ, কাজল মুখার্জী, প্রসাদ, নাইম, আলতাফ, ভবানী রায়, প্রশান্ত সিংহ, শান্ত মিত্র, অশোক চ্যাটার্জী, অসীম মৌলিক, পরিমল দে, প্রণব গাঙ্গুলী, শ্যাম থাপা প্রভৃতি খেলোয়াড়দের স্থান এখুনি অধিকার করবে—এমন খেলোয়াড় কি আমাদের চোখে পড়ছে ?

এই অবক্ষয়ের রচয়িতা হিসেবে বর্তমান আই. এফ. এ-র কর্মকর্তা-দের নাম বাঙলার ফুটবল ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজও বুকের মাঝে ধ্বক্ করে ওঠে।

কতবার ভেবেছি ওদের বারণ করব।

কিন্তু পরে মনে হয়েছে—কি লাভ ?

কটকের ছেলেদের বোঝানো শক্ত যে কলকাতার মাঠে 'স্যার' বললে কেবল একজনকেই বোঝায়। যেমন নেতাজী। দেশেতো নেতার ছড়াছড়ি। কিন্তু ও নামে শুধু একজনকেই ডাকা যায়।

আফসোসের কথা স্যারকে আমি দেখিনি। দেখা সম্ভব ছিল না। আমার জন্মের কয়েক বছর আগেই তাঁর মহাপ্রয়ান।

১৯৪৮-১৯৪৯ সালের কথা। চলেছি কোচবিহারে খেলতে। ইশ্বরদী ষ্টেশনে ইয়া লম্বা চওড়া দশাশই চেহারার এক টিকিট কালেক্টর গোঁফ চুমড়োতে চুমড়োতে আমাদের কামরায় হাজির। ক্রিকেটার পঙ্কজ রায় পরিচয় করিয়ে দিল, সামাদ সাহেব। ভারতের চিরকালের চিরশ্রেষ্ঠ লেফ্‌ট আউট।

সেদিন কথা প্রসঙ্গে বাঙলা, হিন্দী, ইংরেজী এবং উর্দ্দুতে তিনি স্যারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। মনে হল স্যার সশরীরে সেখানে উপস্থিত থাকলে পোষা কুকুরের মত সামাদ সাহেব তার পায়ে লুটিয়ে পড়বেন।

সেই থেকে স্যারের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জানার প্রবল আগ্রহ। অতীতের প্রথিতযশা খোলোয়াড়দের মুখের কিছু চমকপ্রদ গল্প ছাড়া আজও কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ জীবনী কিছুতেই জানতে পারিনি। এরিয়ান টেন্টে ঝোলানো রঙ চটে যাওয়া ম্যাড় মেড়ে বিবর্ণ ছবি ছাড়া তার অন্য ছবি কোথাও দেখতে পাই নি।

মাস দুয়েক আগে 'মাঠ ময়দানে' জার্মানীর প্রাক্তন কোচ সেপ

হারবার্গারের সঙ্গে ১৯৫৪-র বিশ্বকাপ বিজয়ী জার্মান টিমের অর্থাৎ তার ছাত্রদের এক ছবি ছাপা হয়। সেই ছবিটা দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল—স্যারকে ঘিরে যদি তার দিকবিজয়ী ছাত্রদের এরকম এক-খানা ছবি থাকত!—সুঁটে ব্যানার্জী, সামাদ, পূর্ণ দাস, ছোনে মজুমদার, কমল ভট্টাচার্য, করুনা ভট্টাচার্য, পদ্ম ব্যানার্জী, বীরেন রায়, মতিয়ার রহমান, শিশির চক্রবর্তী !!

আজ ভাবতে অবাক লাগে শুধু ব্যক্তিত্বে, ত্যাগে আর সৃজনশীল দক্ষতায়—এক অতি সাধারণ সম্পদহীন ব্যক্তি তাঁর জীবনকালে একটা সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। এতেই কি সেদিনের আর বর্তমানের এই দুই যুগের মানসিক বুনিয়াদের ফারাকটা আজ বেশী করে ধরা পড়ে না ?

আজকের ফ্যাশন বিরোধী হলেও আমি গুরুবাদে বিশ্বাসী। মনে করলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—বিটোফেন দুরু দুরু বক্ষে পার্লারে অপেক্ষা করছেন, কখন গুরু মোজারট তার একটু বাজনা শুনতে চাইবেন। গুস্তাভ ফ্লবেয়র দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ছাত্র মোপাসাঁর লেখা নির্মমভাবে কেটে দিয়ে বলছেন 'কিচ্ছু হচ্ছে না, আরও ছোট করে নিজের ভাব প্রকাশের চেষ্টা কর।'

ক্লান্ত রবিশঙ্করের পিঠে চাবুক চালাতে চালাতে গুরু আলাউদ্দীন খাঁ বলছেন 'রেওয়াজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া ? বার করছি তোমার ঘুম।'

গোরাদের সঙ্গে খেলায় ভাইপো ছোনে মজুমদার বুঝি বুটের ভয়ে নিজের পা ভেরায় নি। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে নির্মমভাবে ছোনের পা বুটের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়ে স্যার বললেন 'যা পরের খেলায় আর ভয় পাবি না।'

ছাত্রের মনে যে 'ফিয়ার ইনস্টিংকট' আছে, তাকে জয় করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষককেই হয়ত সময় সময় এরকম নিষ্ঠুর হতে হয়। কিন্তু তারপরেই দেখি স্যার ছোনেকে [illegible] টেবিল থেকে উঠিয়ে

মাঠে অনুশীলন করতে পাঠিয়ে বলছেন 'ওর ভবিষ্যতের ভাবনা কি? আমার যা আছে, তা সব ওকে দিয়ে যাব।'

এইখানেই স্যার এক এবং অনন্য।

হার্বার্ট চ্যাপম্যান, সিরিক মিলোভান, জেইজলার, ভিনসেন্ট ফিওলা, বেলা গাটম্যান, সেপ হারবার্গার, হেলেনিও হেরেরা, আলফ র‍্যাসসে এবং ফারনান্দো রিয়েরা প্রমুখ আজকের পৃথিবী খ্যাত কোচেদের জীবনী যখনই পড়ি তখন বারবার স্যারের ছবি এদের পাশেই আমার মনে ভেসে ওঠে। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের সাফল্যের যে মূল উপাদানগুলো দেখেছি সেগুলো স্যারের জীবনেও প্রবলভাবে বর্তমান ছিল।

(১) খেলোয়াড় চেনবার অসাধারণ ক্ষমতা এবং তাকে খুব তাড়াতাড়ি নিজের পদ্ধতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ানো এবং তাদের সঙ্গে পিতৃসুলভ ব্যবহার।

(২) বর্তমান ও ভবিষ্যতের ফুটবল সম্পর্কে সুবিস্তৃত জ্ঞান এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিজের পরিকল্পনা প্রয়োগে আপোস বিরোধী অটুট মনোভাব।

(৩) এগারোজনের এ খেলায় বিভিন্ন খেলোয়াড়দের চরিত্র এবং সামর্থ অনুযায়ী অনুশীলনের নিত্য নতুন ধারা প্রয়োগ।

এই তিনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ ১৯৬৭-তে বসে পঞ্চাশ বছর আগের স্যারকে বিচার করলে মনে হয় তিনি অতি আধুনিক।

ট্র্যাজেডির বিষয় হলো প্রয়োজনের অনেক আগেই তিনি এসে গেছেন। আসলে তার আসা উচিত ছিল বর্তমানের ভারতীয় ফুটবলের আসরে।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে 'বুট' একান্তই অপরিহার্য। যে ছাত্রই তার কাছে শিখতে গেছে তাকেই অনুরোধ করেছেন 'বুট পড়ে খেলতে শেখ বাবা, না হলে বুট পড়া গোরাদের সঙ্গে কিছুতেই যুঝতে

পারবে না।' কিন্তু একমাত্র ভাইপো ছোনে ছাড়া তার এ উপদেশ সেদিন কোন ছাত্রই নেয়নি। সবাই পাশ কাটিয়ে গেছে।

বুট পরে বল আয়ত্তে আনার জন্য দেশবন্ধু পার্কে পর পর ইঁট কিংবা ষ্টাম্প সাজিয়ে ওর ভিতর দিয়ে বলকে আউট সাইড-ইনসাইড করতে শিখিয়েছেন। দেওয়ালে দাগ দিয়ে তার উপর বল মারতে বলে, বলের গতিপথ সম্বন্ধে ছাত্রদের নিখুঁত ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন।

সিমেনটের মেঝেকে সাবানের ফেনায় পিচ্ছিল করে তার উপর স্কিপিং করিয়ে, ভিজে মাঠে খেলোয়াড়ের শরীরকে আয়ত্তে রাখার কৌশল শিখিয়েছেন।

স্ট্যামিনা তৈরি করার জন্য ভোরে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে নিজে বসে থেকে ট্রামের পিছু পিছু খেলোয়াড়কে শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা আবার সেখান থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত দৌড় করিয়েছেন।

ফুটবলের ট্যাক্‌টিক্‌সের ওপর উপদেশ দিতে গিয়ে বারবার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ফুটবল একার নয় এগারজনের খেলা। বল যত তাড়াতাড়ি ছাড়বে তত তাড়াতাড়ি বিপক্ষ গোলে পৌঁছবে।

সব সমর্থকদের বিরূপ সমালোচনা অগ্রাহ্য করে স্কুলের ছাত্র পণ্টু গাঙ্গুলীকে দুর্ধর্ষ গোরা টিমের বিপক্ষে খেলাতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। আর একই খেলোয়াড়কে দিয়ে নানান্ জায়গায় খেলানো!

সেখানে ত তিনি আলট্রা-মডার্ণ।

আজ হাঙ্গেরীতে উনিশ বছরের নীচে ছেলেদের কোন নির্দিষ্ট পজিশনে খেলানো হয় না। আগামী দিনের ফুটবল ট্যাক্‌টিক্‌সের কথা ভেবেই এ ব্যবস্থা।

তাহলে স্যারকে ভারতের আধুনিক ফুটবলের হোতা এবং উদ্‌গাতা বলতে বাধা কোথায়?

আজ না হয় অদূর ভবিষ্যতে এই বাঙলা দেশেই তার নাম নিয়ে

হয়ত ষ্টেডিয়ামের নাম হবে। হওয়া উচিত। না হয় তৈরী হবে পাথরের মূর্তি। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার এ নগদ বিদায়ের মূল্য আমার কাছে কানাকড়িও নয়। স্যারের যে ভাব ঘন রূপটা আমাদের মানস সত্তার গভীরে জড়িয়ে আছে তাকে মূর্তিতে ধরবে এমন শিল্পী কোথায়? একটা নমুনা দিই—স্যারের কোন এক ছাত্রের পেটের দারুন অসুখ। ডাক্তার উপদেশ দিয়েছেন টিউবওয়েলের জল খেতে। স্যার তাই প্রতিদিন ভোরে উত্তর কলকাতা থেকে ঘটিভর্তি টিউব-ওয়েলের জল নিয়ে গিয়েছেন কালিঘাটে সেই ছাত্রের বাড়ী। ছাত্রের পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন—এটা খাস তোর অসুখ সেরে যাবে। এই জল বয়ে নিয়ে যাওয়া কিন্তু এক আধ দিনের ব্যাপার ছিল না—ছিল টানা এক মাসেরও ওপর।

১৯৪১ সালে এরিয়ান্স যেদিন আই. এফ. এ শীল্ড পেল সেদিন কে যেন বলেছিল—আজ একজন বেঁচে থাকলে তার বিয়ে দিতাম।

আসলে স্যার নাকি ঠাট্টা করে একদিন বলেছিলেন 'যেদিন এরিয়ান্স আই. এফ. এ-শীল্ড পাবে সেই দিনই বিয়ে করব।'

আমরা কিন্তু জানি স্যার বিয়ে না করলেও তার এক মানস সন্তান ছিল। তাকে আঁতুর ঘর থেকে তুলে, ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার যে দায়িত্ব আই. এফ. এ-র উপর ছিল তা তারা নির্মমভাবে অবহেলা করেছে। বিভিন্ন বিদেশী এসোশিয়েশনগুলো যদি ফুটবলের উপর গাদাগাদা বই ছাপাতে পারে তাহলে এই ৭৫ বছর ধরে আই. এফ. এ একমাত্র ভারতীয় লেখকের একমাত্র ফুটবল শেখানোর বইটি ছাপিয়ে ভারতীয় ফুটবলারদের সামান্য উপকারটুকু করতে পারেন নি কেন?

আমরা আজকের কোচেরা কিন্তু ধন্য হয়ে যাব যদি তার এক কপি মানস সন্তান হাতে পাই উপরে যার লেখা থাকবে হিণ্টস্ টু দি ইয়ং ফুটবলার দুখীরাম মজুমদার।

প্রস্তুতিপর্বে এ্যাথলীটের মস্তবড় সুবিধা যে সে একটা সুনির্দ্দিষ্ট মানকে সামনে রেখে অনুশীলন করতে পারে। যেমন শতমিটার দৌড়বীরের অনুশীলনে ১০·৩ থেকে ১০·৬ সেকেন্ডে দৌড়তে পারলেই এশিয়ান প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ সম্ভব।

কিন্তু ফুটবল প্রস্তুতিপর্বে বিপক্ষকে মাপবার এ জাতীয় কোন সুযোগ নেই। ফুটবলারকে খেলতে খেলতেই বিপক্ষের শক্তির পরিমাপ করতে হয়। তাই ফুটবলে মান সর্বদাই উভয়পক্ষের প্রস্তুতি ও ক্রীড়া-দক্ষতার উপরই ওঠানামা করে।

আজ যে দেশ ফুটবলে বিশ্ববিজয়ী হলো তিন মাস পরেই হয়ত কোন আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হতে পারে। তাই ইয়োরোপ, ল্যাটিন-আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া বছরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ম্যাচের বন্দোবস্ত করে যাতে তাদের ফুটবলাররা অন্য দেশের খেলার মান, ক্রীড়াপদ্ধতি ও অসাধারণ খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-চাতুর্যের সঙ্গে সোজাসুজি পরিচয় রাখতে পারে। তবু সে সব দেশে প্রস্তুতি-পর্বটা চলে অতি গোপনে এবং বিপক্ষের প্রস্তুতিটুকু জানবার জন্য চর পাঠানোর রেওয়াজও আছে।

কিন্তু এ-সব ত পৃথিবীর ফুটবলে যথেষ্ট উন্নত ক্রীড়ামানের দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অনেক পেছিয়ে থাকা এশিয়ার দেশগুলোর খবর যথার্থ কি রকম?

আমাদের পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন খবর বেরোয় না বলে আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ—কোরিয়া, ইস্রাইয়েল, বারমা, জাপান, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশগুলোর প্রস্তুতি ও তার ক্রীড়া-

দক্ষতার যথার্থ খবর না জানলে আজ কেমনভাবে বুঝব ভারতীয় ফুটবল-দল পেছিয়ে পড়ছে কি না! ভারত খারাপ খেলছে বলেই আজ শোচনীয়ভাবে হারছে, না—আজ থেকে দশ বছর আগেও যে সব দেশের খেলোয়াড়রা বলে ঠিকমত কিক্ করতে পারত না তারাই আজ বিদেশী কোচের অধীনে, অসাধারণ ধৈর্য্যের সঙ্গে আধুনিক ফুটবলের তালিম নিয়ে ও উন্নত মানের ফুটবল খেলে নিজেদের খেলার মানকে উপরের দিকে ঠেলে তুলেছে, তাই ভারত পিছিয়ে যাচ্ছে?

তলিয়ে যাওয়া ফুটবলের শোচনীয় ব্যর্থতা দেখে এদেশের বেশীর ভাগ ক্রীড়ামোদীরা আজ দোষ দিচ্ছেন বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যমূলক খেলোয়াড় নির্বাচনকে।

যেমন, ভারতীয় দলে প্রসাদের অন্তর্ভূক্তি ও অধিনায়ক হওয়া, এবং এন. সেনগুপ্তর সংযোজন ও কাজল মুখার্জীর দল থেকে বাদ পড়া। আবার কিছু কিছু দোষ দিচ্ছেন স্বল্পস্থায়ী কোচিং ও দু'জন কোচ বাসা ও প্রদীপ ব্যানার্জীর অকৃতকার্যতাকে; এবং একটা টিমে দু'জন কোচ থাকার কি প্রয়োজন সে প্রশ্নটাও উঠেছে।

খানিকটা সত্য থাকলেও আসলে এ জাতীয় সমালোচনা কিন্তু তথ্যভিত্তিক নয়। পরাজয়ের মূল কারণটা যে সম্পূর্ণ আলাদা তা ধরতে না পারার জন্য ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের অবশ্য বিশেষ দোষ দেওয়া উচিত নয়।

প্রথমতঃ ১৯৪৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারত যত আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে তার কোনটাই তারা দেখতে পায়নি। ব্যতিক্রম—১৯৫১-র এশিয়ান গেমস, ১৯৫৪ সালে কলকাতায় কোয়াড্রাঙ্গুলার, ১৯৫৭ সালে ভারত বনাম ইরানের প্রাক অলিম্পিক খেলা। মাত্র এই কটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ গত ২৩ বছরে ভারতে খেলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বিদেশে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে সংবাদ পত্রের তরফ থেকে যেমন ক্রীড়া-সাংবাদিক পাঠানো হয় ফুটবলের বেলায়

কিন্তু তা হয় না। ফলে নন্-টেক্‌নিক্যাল সাংবাদিকের উল্টোপাল্টা খবর পড়ে আমরা বিদেশে ভারতীয় ফুটবলের অথবা অন্য সব দেশের ক্রীড়া দক্ষতার কোন সুস্পষ্ট ছবিই পাই না।

কিন্তু তবু বিদেশী কাগজে ও মাসিক পত্রিকায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বর্তমান ফুটবল প্রস্তুতির যে খবরটুকু বেরোচ্ছে তাই আমাদের আজ বিস্মিত করেছে; এবং এই বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে ভারতীয় ফুটবল দলের কর্মকর্তাদের ক্রিয়াকর্ম তার পাশাপাশি রাখলেই আমাদের শোচনীয় পরিনতির কারণগুলো বার করতে আর অসুবিধা হবে না।

উত্তর কোরিয়া

১৯৫৭ সালে পৃথিবীর সামনে এশিয়ার ফুটবলকে যে দেশ পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয় সে হলো, উত্তর কোরিয়া। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে যে অপরিসীম কর্মের আর. ঘর্মের ইতিহাসটুকু আছে তার খবর বোধহয় এদেশের খুব কম ক্রীড়ামোদীই রাখেন।

উত্তর কোরিয়া বিশ্ব ফুটবল সংস্থার স্বীকৃতি পায় মাত্র ১৯৫৮ সালে। সালেই তাদের রেজিস্টার্ড ফুটবলারের সংখ্যা আড়াই লক্ষ। ক্লাব সাত হাজার। পিয়াঙ-ইয়াঙের ফুটবল ষ্টেডিয়ামে লোক ধরে ৮০,০০০। ফুটবল যে সেখানে দারুণ জনপ্রিয় তা এই সংখ্যাগুলিই নিশ্চয় প্রমাণ করে।

সালের বিশ্বকাপের ফাইনাল পুলে পৌঁছবার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে উত্তর কোরিয়ান ফুটবল সংস্থা ১৯৫৭ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা নাকচ করে ৩০ জন ফুটবলারকে মিলিটারি ক্যাম্পে, জাতীয় কোচ সুঙ-রি-হুনের অধীনে রাখে; এবং হুনকে এরজন্য করনেল পদে উন্নীতও করা হয়।

ক্যাম্পে যোগ দেবার আগে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অঙ্গীকারবদ্ধ

হতে হয় যে তারা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বিয়ে করবে না এবং তিন বছরের উপর একই সঙ্গে থেকে ট্রেনিং এর মাধ্যমে তারা তাদের শরীরকে যথোপযুক্ত প্রস্তুত অবস্থায় রাখবে। ১৯৬৩ সালের পর থেকে তারা সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টা অনুশীলন করেছে। মাসে একটি করে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে—রাশিয়া, চীন অথবা নিজের দেশেরই প্রখ্যাত টিমগুলার বিপক্ষে। ৩০টি এই ধরনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে তারা হেরেছিল মাত্র দু'টি। দলের নিয়মানুবর্তিতা খুবকঠিন হলেও খেলোয়াড়দের মর‍্যাল কিন্তু খুব উঁচু সুরেই বাঁধা ছিল।

প্রাক বিশ্ব কাপ ম্যাচে তারা অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল ৬-১ ও ৩-১ গোলে। ফাইনাল পুলে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল ইতালিকে হারিয়ে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালকে ৩ গোলে হারাতে হারাতেও ৫-৩ গোলে হেরে যাওয়া পৃথিবীর বিভিন্ন ক্রীড়া-রসিকদের মনে যে চমক সৃষ্টি করেছিল তা বোধহয় কোনদিন মুছে যাবে না।

জাপান

আজ পর্যন্ত এশিয়ার কোন দেশই অলিম্পিক ফুটবলের কোন মেডেলই ঘরে তুলতে পারেনি—একমাত্র জাপান ছাড়া। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিমপিকে ফুটবলে তৃতীয় স্থান অধিকার করে জাপান ব্রোন্‌জ মেডেল পায়। এই সেই দেশ আজ থেকে মাত্র ছয় সাত বছর আগেও যাকে এশিয়ার যে কোন দেশ ফুটবলে অতি অনায়াসেই হারিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সদ্য ইয়োরোপ থেকে ফিরে, জাপানী টিমের ম্যানেজার শুন ওকানো লিখছেন: "দশ বছর আগেও আমাদের দেশের ফুটবল মাঠে দর্শক হিসেবে একজনকেও পাওয়া যেত না। জাতীয় দলের 'হারাটাই' ছিল একমাত্র কাজ। এমনকি পাঁচ বছর

আগেও জাতীয় দলের পরাজয় জনমানসে কোনোরকম প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতো না। কিন্তু আজ?

আজ যদি কোন বিদেশীদল আমাদের হারিয়ে দেয় তাহলে আমি অজস্র ক্রীড়ামোদীর কাছ থেকে ফোন পাই এবং আমাকে জবাবদিহিও করতে হয় সেই সঙ্গে কাগজে নির্মম সমালোচনাও বের হয়। এই লক্ষণগুলো অবশ্য আমাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাই প্রমান করে এবং এটি এত দ্রুতহারে বাড়ছে যে একে 'বাড়া' না বলে 'সশব্দে ফেটে পড়া' বললেই যথার্থ বলা হয়।

আজকের জাপানী যুবকের ৩৫% ফুটবল খেলছে। এখন পর্যন্ত জাপান ফুটবল সংস্থা মাত্র তিনজন পেশাদার কোচকে চাকরী দিয়ে রেখেছে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সময়, উৎসর্জন ও টাকার উপর।"

এরপর ওকানো আত্মসমালোচনা করে লিখছেন—"অপেশাদারদের দিয়ে আজকের ফুটবলে বিশ্বমানের কাছাকাছি পৌছন কিছুতেই সম্ভব নয়—তা ফুটবলার বা কোচ যেই হোক না কেন। আমাদের ফুটবলাররা সব অপেশাদার। কাজেই তারা তাদের ভবিষ্যতের ভাবনা নিশ্চয়ই ভাববে। যদিও আমাদের খেলোয়াড়রা সবাই ভাল চাকরী করে তাহলেও ফুটবল নিয়ে হরদম মেতে থাকলে ভবিষ্যতে তারা নিশ্চয়ই তাদের চাকরীস্থলে সহকর্মীদের চেয়ে অনেক পিছনে পড়বে। কেননা সহকর্মীরা তাদের চাকরী ও অধ্যয়নেই দিনের সবটুকু সময় ব্যয় করে।

ইরান

ইরানের শাহ যখন আরমিতে ছিলেন তখন আরমি ফুটবল-টিমে তিনি সেন্টার হাফ খেলতেন। তিনি মনে করেন—ফুটবল খেলা ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে সাফল্যলাভ তার দেশের সামাজিক সংস্কারে বিরাট সাহায্য করবে। কিন্তু শুধু ইচ্ছাই যে আন্তর্জাতিক ফুটবলে

সাফল্য আনে না এ সত্য শাহ জানেন। তাই তিনি সম্প্রতি তার শিক্ষা-দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে এশিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করবে ইরান; এবং আগামী দুই বছর এই বিষয়টিকে তাব উপরোক্ত দপ্তরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উদ্যম অথবা টাকার পরিমাণের কোন প্রশ্নই উঠবে না এবং যত বৈপ্লবিকই হোক ইরানের জারমানির বিশ্বকাপ ফাইনাল পুলে পৌঁছতে সব কিছু করা হবে।

ইরান ফুটবল-সংস্থা করনেল-গুলিকে তাই প্রথমেই কোচের জোগাড় করতে মাদ্রিদ পাঠিয়েছে কিন্তু পিছিয়ে থাকা দেশকে শিক্ষা দিতে সুদক্ষ আন্তর্জাতিক কোচ বারাঙ্গা প্রচুর টাকার বিনিময়েও কর্নেলগুলির এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। কেননা তিনি এখন মরক্কোর জাতীয় কোচ।

করনেলগুলি এরপর স্পেনের অনেক নামকরা কোচের সঙ্গে কথা বলছেন এবং অবশেষে ইটালি গেছেন। পৃথিবীর এক নম্বর কোচ (বাৎসরিক দক্ষিণা যার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা) হেলেনিও হেরেরার সঙ্গে কথা বলতে। হেরেরা এর কিছুদিন আগে ইরান ঘুরেও গেছেন।

সম্প্রতি ইরানে এশিয়ান ফুটবল কংগ্রেসে যোগদান করতে এসে বিশ্ব-ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট সার ষ্টানলি রাউস ইরানের ফুটবল সংস্থার অস্বাভাবিক উদ্যোগ দেখে ভবিষ্যৎ বাণী কবেছেন "আগামী দুই থেকে পাঁচ বছরের ভিতরই আশা করা যায় ইরানে ফুটবল খুব চলতি হবে।"

আজ বহু ক্লাব ও সুদক্ষ ফুটবলার ইরানে আছে কিন্তু চালুনি দিয়ে ছেঁকে বাছাই করবার জন্যে যে ষোলোটা টিম নিয়ে লীগ প্রথা চালু থাকা দরকার খেলার মাঠের অভাবে সেটা আজও ইরানে হয়ে ওঠেনি। অধিকাংশ জুনিয়র ক্লাবগুলো শহরের ধারে বালি ভর্তি মাঠেই ফুটবল খেলে।

বর্তমানে ৩৫,০০০ হাজার লোক ধরে এমন একটি মাত্র ষ্টেডিয়াম

ইরানে আছে। এ মাসে এক লক্ষ লোকের একটি ষ্টেডিয়াম তৈরীর কাজ সুরু হয়েছে ও আগামী কয়েক মাসেই আর একটি ষ্টেডিয়াম তৈরী হবে যার দর্শক সংখ্যা ৩০,০০০।

ইরান ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেণ্ট করলেন মুকরীর বৈপ্লবিক কাজ হলো অর্থনৈতিক অবস্থার নতুন পরিবর্তন। এতদিন পর্যন্ত ক্লাবগুলো পাচ্ছিল গেটমানির ২০% আর সংস্থা ৮০% কিন্তু এরপর থেকে এই ব্যবস্থা উলটে যাবে। ক্লাব পাবে ৮০% ও সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট থেকে প্রচুর টাকা যা খরচ করতে হবে ক্লাবকে কোচিং মাধ্যমে বিদেশী কোচ আনিয়ে, খেলার মাঠের পিছনে ও খেলোয়াড়দের বোনাস দিয়ে।

করনেলগুলি তাই আজ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলছেন—"যদি উৎসাহ এবং সঙ্কল্প সাফল্যের মাপকাঠি হয় তাহলে ইরান বিশ্বকাপ জয় করবে।"

ইস্রায়েল

ইস্রায়েলকে ঠিক এশিয়ার কোনো দেশ বলে মেনে নিতে আমাদের বাঁধে। সারা পৃথিবীর নানান্ দেশের ইহুদী (বিশেষ করে জারমানি থেকেই বেশী) সংমিশ্রনে যে আকৃতি আজ ইস্রায়েলবাসীর হয়েছে, তার সঙ্গে ইয়োরোপের যে কোন দেশেরই মিল রয়েছে বেশী। ইস্রায়েলী ফুটবলারদের শরীর ও তাদের ক্রীড়াপদ্ধতি এটা আরও বেশী করেই প্রমাণ করে। তবু ইস্রায়েলী ফুটবল সম্পর্কে আমাদের বেশী করে খোঁজ রাখা দরকার, কেননা তারা এই এশিয়ান গ্রুপ থেকেই অলিম্পিক ও বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা করে। গত মেক্সিকোর বিশ্বকাপে ইস্রায়েল এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং সেখানে তারা যদিও উত্তর কোরিয়ার মত কোন চিরস্মরণীয় ক্রীড়াশৈলী রাখতে পারেনি কিন্তু তবুও তারা খুব খারাপ খেলেনি। মেক্সিকোর ফাইনাল পুলে তারা মাত্র ২-০ গোলে হেরেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইস্রায়েলী ফুটবলের মান আজ নিম্নমুখী। ইস্রায়েল ফুটবল সংস্থার কর্মকর্তারা আজ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলায় এতই টইটুম্বুর যে ওদেশের গভর্ণমেণ্টকে তেল আভিভের সংবাদপত্রগুলোর প্রচণ্ড লেখালেখির ঠেলায় কমিশন বসাতে হয়েছে। কমিশন দেখলো তথাকথিত নামে অপেশাদার খেলোয়াড়রা মাসে বেআইনি-রোজগার কবছে প্রায় আড়াই হাজার টাকার মত। পুল-সিণ্ডিকেট থেকে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে শুধু যে ফুটবলাররাই অপরাধী তাই নয়, ইস্রায়েল ফুটবল-সংস্থার অধিকাংশ সভ্যরাই সমান দোষে অপরাধী। যার ফলে সংস্থাব কাঠামোটাতেই ঘুন ধরে গেছে। নৈতিক মান সেখানে এতই নিম্নগামী যে ইস্রায়েলের অনেক প্রখ্যাত ক্লাবই খেলা ছাড়া-ছাড়ি করেছে; আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গোলকীপার সোরিনভ আবার ম্যাচ ছাড়াছাড়ির বন্দোবস্ত কবিয়ে দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। যেখ নে খেলোয়াড়রা ম্যাচ ছাড়তে অথবা ঘুষ নিতে রাজী হয়নি সেখানে জুয়ারীরা সেই খেলোয়াড়কে জানে খতম করে দেবার ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে।

এই দুর্নীতি ও নৈতিক বিপর্যয় থেকে ইস্রায়েল ফুটবলকে বাঁচাতে ও দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী ইয়াগাল এল্লোন ইতিমধ্যেই দারুন কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন। প্রথমেই তিনি আইন করেছেন গভর্ণমেণ্টই ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করবে। তিন বছর অন্তর নির্বাচন করতেই হবে; এবং একবারের বেশী কেউ কমিটির সভ্য ও এই কমিটির সভ্য থাকাকালে কেউ বেটিং কমিটির সভ্য হতে পারবে না।

সবশেষে তিনি সুপারিশ করেছেন; এই গোপন অর্থ পেশাদারীর বদলে প্রকাশ্য পেশাদারী প্রথা ইস্রায়লে এখনই চালু করা হোক একমাত্র যার দ্বারা বরাবরের জন্য এই ধরনের নোংরামী বন্ধ করা যাবে।

এইবার এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পটভূমিকায় ভারতীয় ফুটবল

সংস্থার ক্রিয়াকর্মকে বিচার করা যাক্। কিন্তু তার আগে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের (বিশেষ করে ফুটবলে উন্নতমানের দেশে) ফুটবল সংস্থার কাজকে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমটি হলো : কার্যনির্বাহক দিক অর্থাৎ সংস্থার অধীনে লীগ, শীল্ড, প্রভৃতি বিভিন্ন টোর্নামেন্টগুলো সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পন্ন হয়ে যাতে খেলার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ; কেননা জনপ্রিয়তাই খেলাকে জিইয়ে রাখে।

আর দ্বিতীয়টি হল : আন্তর্জাতিক খেলায় তার দেশের প্রস্তুতিপর্ব এমন জোরদার ও ভাবমূর্তি এমন জীবন্ত করা যার দ্বারা বিশ্বের সর্বত্র তার দেশের পরিচয় ও স্বীকৃতিটুকু যেন জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে। এরই সঙ্গে বর্তমান সংস্থাকে আগামী দিনের জন্য যোগ্য ফুটবলার তৈরী করার কাজও করতে হয় অর্থাৎ বিস্তৃত ও নিখুঁত কোচিং প্ল্যান, যার মাধ্যমে আজকের কুঁড়িগুলো আগামী দিনে ফুল হয়ে বিশ্বে সৌরভ ছড়াবে।

ভারতীয় ফুটবলে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব শ্রী এম. দত্তরায় ও শ্রীজিয়াউদ্দীনের। তাঁরা যে জনপ্রিয় বলেই নিখিল ভারত ফুটবল সংস্থার সভাপতি ও সেকরেটারি পদে একটানা কুড়ি বছর অবস্থান করছেন তা নয়, যে চতুরতা ও বিকৃত দলীয় রাজনীতির প্রয়োগবলে গদি এমনিভাবে এদেশে দীর্ঘকাল আঁকড়ে রাখা যায় তার কৌশল— এই দুই ভদ্রলোক এ দেশের যে কোন উচ্চ রাজনৈতিক নেতার চেয়েও ভাল করে বোঝেন।

এই সংস্থা আই. এফ. এ শীল্ড, রোভারস ও ডুরান্ড এই তিনটি ট্রফিকেই এ দেশের শ্রেষ্ঠ টুরনামেন্ট বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরই ভিতর ডুরান্ড ও রোভারস এই দুটি কোনরকমে টিঁকে আছে। কুড়ি বছর আগে এই দুটি টুরনামেন্টের মাঠের পিচের যা অবস্থা ছিল বর্তমানে উন্নত না হয়ে বরঞ্চ আরও খারাপ হয়েছে। এই দুটি

মাঠেই ষ্টেডিয়াম হওয়া ত দূরের কথা, আগের তুলনায় ইদানীং একটি আসন সংখ্যাও বাড়েনি।

বোম্বের কুপারেজ মাঠে যে ফ্লাড-লাইটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে তা এতই ত্রুটিপূর্ণ যে ওখানে কোন উন্নত মানের টিমের ফুটবল খেলাই উচিত নয়।

বাকী রইল ভারতের 'ব্লু রিবণ্ড' আই. এফ. এ শীল্ড। বর্তমান নিখিল ভারত ফুটবল সংস্থা ও আই. এফ. এ-র কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের নীল রেশমী ফিতাটি কবে যে গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেছে তার কোন খবরই এরা রাখেন না। অপমৃত্যুর জন্য দায়ী হলেও এরা কিন্তু অকসিজেনের ফানেলটা মৃত আই. এফ. এ শীল্ডের নাকের কাছে আজও ধরে রেখেছেন।

এই তিনটি বাদে যে ট্রফিটাকে সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের দলের রাগী সভ্যদের বশে আনতে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন সেটি হোল সন্তোষ ট্রফি। উড়িশার জাতীয় কোচ থাকাকালে, উড়িশা ফুটবল সংস্থাকে, এই ট্রফি থেকে খরচ খরচা বাদ দিয়ে লাভ করতে দেখেছি ৭৫ থেকে ৮০ হাজার টাকা। তাই বিভিন্ন প্রদেশের মাঝে সন্তোষ ট্রফির ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপারটা আজও সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের কাছে ধোঁয়াটে লাগে। মহীশূর, কেরল, আসাম, উড়িশা প্রভৃতি প্রদেশগুলি ৫।৬ বছরের ভিতরই দুইবার সন্তোষ ট্রফি খেলাবার সুযোগ পেয়েছে ; আবার বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে আজ পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফি অনুষ্ঠিতই হয়নি।

বাঙলার ব্যাপারটা ত আরও বিস্ময়কর। শেষ সন্তোষ ট্রফি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫৩ সালে ও আগামী ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এ ট্রফি বাঙলায় অনুষ্ঠিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান বাঙলা দেশে এ ট্রফিটা বিশ বছরেও অনুষ্ঠিত না হবার কারণটা কি? বাঙলার ক্রীড়ামোদীরা কি এই ট্রফির খেলাগুলি দেখতে মোটেই আগ্রহী নয়?

আসলে শ্রী এম. দত্ত রায় তার দল ও গদী রাখতে, অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে—এই সুযোগটুকুও অন্য প্রদেশের হাতে তুলে দিয়েছেন। আই. এফ. এ তার হাতের মুঠোয় থাকায়, নিখিল ভারত ফুটবল সংস্থার কাছে তাই বাঙলার তরফ থেকে, এ সম্পর্কে কোন দাবীই এই বিশ বছরে ওঠেনি। আর বাংলার ক্রীড়ামোদীদের সেনটিমেন্‌ট শ্রী দত্ত রায় সবচেয়ে বেশী বোঝেন। এখানকার ক্রীড়ামোদীরা যে তাদের প্রিয় ক্লাবের সাফল্য নিয়েই সন্তুষ্ট এবং এই ট্রফির খেলা কলকাতায় অথবা কামাস্কাটকায় হল—এ নিয়ে যে তাদের মাথাব্যথা নেই—এ তথ্য তিনি ভাল করেই জানেন।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই সন্তোষ ট্রফির ভবিষ্যৎ আজ আশঙ্কাপূর্ণ। প্রাদেশিকতার নোংরামি ক্রমশঃ এই টুরনামেন্‌টকে গ্রাস করছে। তার প্রমাণ কটক মাঠে পটকা ফেলা, মহীশূরে অন্যায়ভাবে মাদ্রাজকে হারিয়ে দেওয়া ও ফাইনালে বাঙলার সকলের প্রতি বর্বরোচিত ব্যবহার এবং পাঞ্জাবে, পাঞ্জাবের সর্ববিধ অন্যায় কাজ করে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করা—এইটাই প্রমাণ করছে যে অদূর ভবিষ্যতে যে প্রদেশেই এই ট্রফিটি অনুষ্ঠিত হবে সেই প্রদেশেরই এইরকম নোংরামি করে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে এতটুকু বিবেকে বাঁধবে না। এর ফলে এ দেশের ফুটবলে যথেষ্ট ক্ষতি ত হবেই, বিদেশেও ভারতের সম্মান যথেষ্ট কমবে। কেননা এই ট্রফির বিজয়ী দলই, এশিয়ান কাপে যোগদানের অধিকারী; এবং গত বছরে এশিয়ান কাপে পাঞ্জাবের সর্বসাকুল্যে ৫০টা গোল খাওয়াই এ সত্য প্রমাণ করে।

নিখিল ভারত ফুটবল সংস্থার কার্যনির্বাহক কমিটি চোখের সামনে ঘটা এইসব কিছু দেখেও না জানার ভান করে মুখটি ঘুড়িয়ে আছেন; এবং এর প্রতিকারের আজ পর্যন্ত কোন চেষ্টাই করেননি। আসলে তারা বিশ বছর ধরে 'নীরবতাই স্বর্গ' এই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

শুধু একবার এদের সরব হতে দেখা গিয়েছিল ভারতের প্রথিতযশা সেনটার ফরোয়ার্ড মেওয়ালালের ক্ষেত্রে। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক থেকে ফিরে তিনি কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, ভারতীয় দলের ১০-১ গেলে শোচনীয় পরাজয়ের প্রধান কারণ দলের অধিকাংশেরই ওখানে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও ক্যাম্পের আইন-কানুন কিছু না মানা। এই বিবৃতিতে সংস্থার কিছু কর্মকর্তার নাম জড়িয়ে পড়ায় নিখিল ভারত ফুটবল সংস্থা তাড়াতাড়ি তাদের সংস্থার আইন 'কোন খেলোয়াড় খবরের কাগজে বিবৃতি দিতে পারবেন না'—ভঙ্গের অজুহাতে, মেওয়ালালকে ভাবতীয় ফুটবল দলে অংশ গ্রহণ করার অধিকার থেকে বিচ্যুত করেন।

বিদেশী ফুটবলের খবর রাখেন কিছু কিছু ক্রীড়ামোদী প্রায়ই প্রশ্ন করেন ভারতীয় ফুটবল সংস্থা সর্বক্ষণের জন্য একজন জাতীয় কোচ নিয়োগ করে তারই হাতে জুনিয়র ও সিনিয়র ভারতীয় দল গঠনের সম্পূর্ণ ভাব ছেড়ে দেন না কেন? এই সংস্থার কর্মকর্তাদের খেয়াল খুশীমত এলোমেলো প্রস্তুতি দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে যে সাফল্যলাভ সম্ভব নয় তা কি সামান্য মারডেকা টুর্নামেন্টই বারবাব প্রমাণ করছে না? অথচ কয়েক বছর আগেও অনেক পিছনে পড়ে থাকা বার্মার মত টিমও আজ কি জুনিয়র, কি সিনিযরে বারবাব চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে না?

এই সব প্রশ্নেব উত্তেবেও সেই দওবায়-দলের কথাই আবার এসে পড়ে—যারা তিন বছব অন্তর ভোটের সাহায্যে গদি আকড়ে থাকবাব জন্য এই সুযোগগুলিকে ব্যবহার করেন। তাই শ্রীদত্তরায় এই সংস্থার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়-নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের পদটিও অধিকার করে আছেন—যাতে বিদেশে ভারতীয় দল পাঠানোর সময় ম্যানেজার ও খেলোয়াড় নির্বাচনে পুরো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন; এবং এই নির্বাচক-কমিটিতে যাতে তাকে অসুবিধায় না পড়তে হয় তাই তার দলের শ্রীশৈলেন মান্না ও

অন্ধ্রের নুরমহম্মদকে নির্বাচক-কমিটির সভ্য করে রেখে দিয়েছিলেন। তারা এই পদে একটানা দশ বছরেরও বেশী বহাল তবিয়তে অধিষ্ঠিত থাকেন। শুধু নির্বাচক-কমিটির তৃতীয় আসনটিকে প্রয়োজন মত খালি ও ভর্তি করান হয়। যেমন কয়েক বছর আগে ছিলেন এই পদে নেভিল ডিসুজা, টি· আও· জার্ণাল সিং।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বছর পরও এমন ভারতবাসী খুব কমই আছেন, যিনি বিদেশ ভ্রমণের, তাও আবার পরের পয়সায় সুযোগ পেলে ছেড়ে দেবেন। তাই দত্তরায়ের দলের কেউ উল্টো পাল্টা চললেই—তাকে বিদেশে ভারতীয় দলের ম্যানেজারের লোভণীয় পদটি দেওয়া হয়। কোন রাজ্য থেকে বেশী চেঁচামেচি উঠলে—তাকে শান্ত করতে দু একটা সেই রাজ্যের খেলোয়াড়কে ভারতীয় দলে নেবার বহু দৃষ্টান্তই আছে। তবে ১৯৫৭ সালের ভারতীয় দলের রাশিয়া-ট্যুরে চারজন কর্মকর্তা ও দু'জন কোচ পাঠানোর ঘটনাটা আগের রেকর্ডগুলিকেও ম্লান করে দিয়েছে।

বিদেশ থেকে যখনই কোন টিম এদেশে খেলতে আসে তখন সে দলে থাকে একজন ম্যানেজার, একজন কোচ, একজন ডাক্তার, একজন সম্বাহক ও কমপক্ষে ষোলোজন খেলোয়াড় ও দীর্ঘ ট্যুর হলে কুড়িজন খেলোয়াড়।

আগামী ১৯৫৭ সালে, ভারতীয় ফুটবল দলকে যখন প্রি-ওলিম্পিক ও প্রিওয়ার্ল্ড কাপের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে হবে এবং যেখানে ফলাফলের সঙ্গে এত বড় একটা দেশের সম্মানও বিশেষভাবে জড়িত—সেইখানে এই ধরণের আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিজ্ঞতা লাভ করবার অমূল্য সুযোগটুকু খেলোয়াড়রা না পেয়ে—ঐ চারজন কর্মকর্তাদের ঘাড়ে গেল কেন?

১৯৫৭-র সংস্থার নির্বাচনে শ্রীদত্তরায় ও তার দল যাতে নির্বিঘ্নে গদি লাভ করে আরও তিন বছর নিশ্চিন্ত হতে পারে—সেইজন্যই নয় কি?

তবে শ্রীদত্তরায় ও তার দলের বড় কৃতিত্ব—ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের ধোঁকা দিতে কিছু নির্বোধ কোচকে সামনে রেখে কোচিং কোচিং খেলার প্রহসন সৃষ্টি করা। ১৯৫৭ সালে রহিম সাহেবের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত এই আট বছরে ভারতীয় দলকে কোচ করেছেন আটজন—সর্বশ্রী উইলি রাইট, রবীন মুখার্জী, ল্যাংচা মিত্র, মহম্মদ হোসেন, শৈলেন মান্না, জার্ণাল সিং, বাসা ও প্রদীপ ব্যানার্জী।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সাফল্য-লাভ করতে গেলে যে পরিবেশ, সময়, সুযোগ ও খেলোয়াড় নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতাটুকু কোচের অবশ্যই পাওয়া দরকার—তা না আদায় করে—স্রেফ জাতীয় কোচ হবার ও বিদেশ ভ্রমণের মোহে, এরা নিজেদেরকে সংস্থার কাছে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন বলেই—আমি এদের নির্বোধ বলতে বাধ্য হয়েছি ; এবং এই নির্বুদ্ধিতার মাত্র সাধারণ দুটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি।

এক

ক্যাম্প করবার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্যই হল খেলোয়াড়রা একসঙ্গে থাকলে নিজেদের ভিতর বোঝাপড়া ও দলের ভিতর সামগ্রিক বোধ বাড়বে ও সেই সঙ্গে দেশের ভাবমূর্তিও জ্বলজ্বলে হয়ে উঠবে এবং যেটার অভাব থাকলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সাফল্যের কোন আশাই থাকে না। এই সমস্যাটা আবার আয়তনে ছোট দেশের যেমন বার্মা বা কোরিয়ার বেলায় স্বল্প সময়েই সমাধান করা যায় কিন্তু ভারতের মত বিশাল, বিভিন্ন ভাষাভাষি ও ধর্মাবলম্বীর দেশে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখানে তাই সময় লাগে দীর্ঘদিন এবং সেটাও কোচের ব্যক্তিত্ব ও সহনশীল-ক্ষমতার উপরই বিশেষ নির্ভর করে।

১৯৫৭-র মারডেকার আগে বোম্বাইতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা অনুশীলন করেছিল একত্রে মাত্র তিনদিন। তার আগে কলকাতায়

দশদিন কোচিং ক্যাম্পে বাঙলার খেলোয়াড়রা এবং কলকাতা থেকে এগারোশো মাইল দূরে বোম্বাইতে বাকী ভারতীয় খেলোয়াড়রা অনুশীলনে ব্যস্ত ছিল। কলকাতার ক্যাম্পে যে খেলোয়াড়টি দশদিনের দশদিনই উপস্থিত হয়েছিল—সেই জহর দাসই বোম্বাই পর্য্যন্ত যেতেও পারেনি।

দুই

অ্যাক্লিমেটাইজেসন—নতুন আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়া ও কনডিশনিং-সপ্রতিবন্ধ করণ—কোচিং এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন কোন সমতলবাসী খেলোয়াড়কে যদি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০০০ হাজার ফুট ওপরে খেলতে বলা হয় তাহলে সে যতই দমওয়ালা ফুটবলার হোক না কেন, অক্সিজেনের স্বল্পতায়-অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। আবার যে ফুটবলার কোনদিন বৃষ্টিভেজা পিছল মাঠে খেলেনি তারপক্ষে ঐ ধরনের মাঠে প্রথম সাফল্য লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়—তা সে যতই দক্ষ ফুটবলার হোক।

এই অসুবিধাগুলোর হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় ঐ ধরনের উচ্চতার কোন মাঠে কম পক্ষে দশদিন অনুশীলন করা ও সপ্রতিবন্ধ করণের ক্ষেত্রেও এই ফর্মূলা সমান প্রযোজ্য।

কুয়ালালামপুরের পীচ যে দারুণ কর্দ্দমাক্ত আকার ধারণ করে—তা ১৯৫৭ সালের ভারতীয় দলের ম্যানেজার মিঃ ভিট্টল বার্মার কাছে ভারতের ৯-১ গোলে শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বলে কাগজে বিবৃতিও দিয়েছেন—এ সত্য সকলের জানা থাকা সত্বেও বোম্বাই এর মত শুক্নো, বালি ভর্তি অতি কঠিন মাঠে (এবং যেখানে বৃষ্টি পড়লেই খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়) বছরের পর বছর প্রস্তুতিপর্ব রচনা করবার কি টেক্নিক্যাল যুক্তি থাকতে পারে?

বোম্বাইয়ের অঞ্জুমাণ স্কুলের একটি মাত্র যে ঘরে—কমপক্ষে ত্রিশজন ফুটবলারকে ঠাসা হয়—সে বিষয়ে পুরো বর্ণনা দিতে হলে

একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রবন্ধই লিখতে হয়। এই ঘরে দুটি মাত্র পাখা। একটি পায়খানা ও একটি কলঘর। কোনের দিকে যার সীট পড়বে তাকে তার নিজস্ব সীটে যাওয়া আসা করতে হলে সবাইকার বিছানা মাড়িয়েই করতে হবে।

খাবার আসে বাইরের সস্তা হোটেল থেকে এবং সময়ের কোন ঠিক নেই। সে রান্নাও আবার ঝাল এবং মশলায় এমন মাখামাখি যে অধিকাংশ খেলোয়াড়ই মুখে দিতে পারে না। এরই নাম ভারতীয় ফুটবল ক্যাম্প এবং ক্যাম্পে এই রকম ভাবে থেকে ভারতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা আশা করেন যে এরাই বিদেশ থেকে ট্রফি এনে দেবে।

ক্যাম্প থেকে মাঠের দূরত্ব দু'মাইলের বেশী। খেলোয়াড়ের পকেটে পয়সা না থাকলে প্রতিদিন তাকে হাঁটতে হবে সাকুল্যে আট মাইল। পয়সা থাকলে ট্যাক্সির দরুণ খেলোয়াড়দের পকেট থেকে যাবে দিনে ৪ টাকার মত।

যদি প্রশ্ন ওঠে এই সব খেলোয়াড়রা এই বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় না কেন ? তাহলে উত্তরে বলতে হয় তারা নিশ্চিতই দল থেকে বাদ পড়বে এমন কি সারা জীবনের মতই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৫৭ সালের একটা ভারতীয় ফুটবলের ট্রেনিং ক্যাম্পের কথা। সেবারও ক্যাম্প হয়েছিল ঐ বোম্বাইতেই। খেলোয়াড়দের থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল মঙ্গলদাস মার্কেটের কাছেই এক অতি জঘন্য মুসাফির খানায়। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিলেন তখনকার ভারতের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী; এবং তার বিবৃতি ও প্যাসেজে শুয়ে থাকা ফটো যুগপৎ টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে ছাপাও হয়েছিল। দুষ্ট লোকেরা বলে—তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে ভারতীয় ফুটবল থেকে চুণীর অবসর নেবার একমাত্র কারণ ছিল ঐ বিবৃতি।

সংস্থার তরফ থেকে আগামী দিনের যোগ্য খেলোয়াড় তৈরীর

ব্যাপারটা আমি এ প্রবন্ধে অপ্রয়োজনীয় বলে আর তুলছিই না—কেন না যার মাথাই নেই তার আবার মাথা ব্যথা!

ক্রীড়া দক্ষতাই নয়, পৃষ্ঠপোষকতাই ভারতীয় ফুটবল দলে ঢোকবার আজ প্রধান অবলম্বন—এই সত্যটি শ্রীদত্তরায় তার বিশ বছরের রাজত্বে আজকের ফুটবলারদের মনে বেশ ভালভাবেই গেঁথে দিতে পেরেছেন। আর পেরেছেন ভারতীয় ফুটবল ও ফুটবলার সম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের মনে যে 'ইমেজ'টুকু ছিল তা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে।

'আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতীয়দের দিয়ে কিছু হবে না'—এই যে হতাশার উক্তি তিনি আজ জনসাধারণের মুখ দিয়ে বলাতে পেরেছেন তার স্রষ্টা ও ধারক হিসেবে তিনি ও তার দলবল ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রাজ্য ক্রীড়া-পর্ষৎ সভাপতিকে খোলা চিঠি—

মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদার সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনাকে হাইকোর্টের বিচারপতির সুউচ্চ আসনে দেখবার সৌভাগ্য কখনো হয়নি কিন্তু আই. এফ. এ লীগ-শীল্ডের চ্যারিটি ম্যাচে কিংবা বড় ক্লাবের বড় খেলাগুলিতে মাঠের সাইড লাইনের পাশেই গদী-লাগানো শোফাতে কখনও একা অথবা সস্ত্রীক আপনার উপস্থিতি আমাদের রোমাঞ্চিত করেছে।

আবার বিদেশী ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার আগে আপনার করমর্দন আমাদের মত ফুটবল-পাগলদের যথেষ্ট গর্বের কারণও হয়েছে। কর্মবহুল জজীয়তি-জীবনের বাইরে চুঁইয়ে-পড়া আপনার দুর্মূল্য সময়টুকুও যে আপনি খেলাধুলোর পিছনে উৎসর্গ করেছেন তা দেখে আমরা বিস্মিত।

গত বছর আপনি যখন পশ্চিমবঙ্গ স্পোরটস-কাউনসিলের সভাপতির পদটিও অলঙ্কৃত করলেন তখন অবাক হলেও পরে সে বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গিয়েছিল। যদিও শ্রীমির্ধা ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের ছোট-বড় সব কর্তারাই প্রায় কাগজে বিবৃতি দেন যে, একই ভদ্রলোক কিছুতেই একাধিক ক্রীড়া-সংস্থার কর্মকর্তার পদ অধিকার করতে পারবেন না বা করতে দেওয়া হবে না—কিন্তু আপনি সেইসব বিবৃতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এই সুপ্রাচীন দেশের ক্রীড়াসংস্থাগুলিতে পদ-আঁকড়ে থাকা অন্যান্য ভদ্রলোকের যদি পদানুসরণ করেও থাকেন তাহলে আমরা নালিশ জানাব কার কাছে?

কিন্তু মুস্কিল হল যে, আমরা এখনও ঠিক বুঝতে পারি না—

আই. এফ. এ-র মত প্রাচীন ও পশ্চিমবঙ্গ স্পোরটস-কাউনসিলের মত আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থার সভাপতির 'পদোচিত কর্তব্য' কি ?

যথারীতি করমর্দন ও সংস্থার বিশেষ সভাগুলিতে সভাপতির পদে আসীন হয়েই কর্তব্য শেষ, না সেই সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও তার জনপ্রিয়তাকে বাড়ানোর জন্য এই প্রদেশের বিভিন্ন জাগায় স্টেডিয়াম গঠনে সবিশেষ উদ্যোগী হওয়া।

আপনি নিশ্চয় জানেন যে সংস্থা নিজে নিজে ক্রিয়া করে না— মানুষই একজোট হয়ে সংস্থার মাধ্যমে তার কল্পনা ও কর্মদক্ষতাকে রূপ দেয় এবং তারই প্রধান রূপকার হিসেবে আমরা যদি আপনাকে দেখতে চেয়ে থাকি—তাহলে আমরা কি আপনার কাছ থেকে খুব বেশী আশা করেছি ?

বছর দশ বারো আগে শ্রী অতুল্য ঘোষকে যখন আই. এফ. এ-র সভাপতি করা হল, তখন ক্রীড়ামোদীরা আশা করেছিল দিল্লীতে উনি ওনার প্রভাব খাটিয়ে কলকাতায় অন্তত একটি ষ্টেডিয়াম করে দেবেন।

আবার বাঙলার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতুল্য-বাবুকে সরিয়ে বামপ্রান্তিক নেতা ব্যারিষ্টার শ্রী স্নেহাংশু আচার্যকে যখন আই. এফ. এ-র সভাপতি পদে বসান হল তখন প্রত্যয় ছিল যে এবার শুধু ষ্টেডিয়াম গঠন নয় আই. এফ. এ-র ভিতর যে দুষ্টচক্রের জীবাণুগুলো দীর্ঘকাল জমাট বেঁধে তার সারা শরীরটাকেই কুরে কুরে খাচ্ছে সেই চক্রটাকেই উনি সমূলে ধ্বংস করবেন।

সে পালা বদলের পালার পরে আপনাকে আনার পালা। কি কারণে আপনাকে আনা হল বা আপনি আসার পর আই. এফ. এ-র প্রভাবশালী গোষ্ঠীচক্র কি ধরণের লাভবান হল তা আমরা জানি না। কিন্তু বর্তমানে এই সংস্থার আইনশৃঙ্খলা, ক্রীড়ামান, লীগ ও শীল্ডের শোচনীয় পরিণতি যে ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিকৃত ও হাস্যকর হয়ে উঠেছে তা বোধহয় আপনাকে বলে দিতে হবে না।

কিন্তু শুধু আই. এফ. এ-র ক্রটিগুলি তুলে ধরাই এ খোলা চিঠির উদ্দেশ্য নয়।

আপনি বোধহয় জানেন যে, পশ্চিম বাঙলার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা আজও ফুটবল; এবং তা সর্বাঙ্গীনভাবে কলকাতা-কেন্দ্রীক। কলকাতায় আশ্রয় কিংবা এখানকার কোন ক্লাবের দাক্ষিণ্য না পেলে জেলার কোন ফুটবলারের পক্ষেই সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। তাই সেসব এখানে আলোচনা না করে শুধু কলকাতার হবু ফুটবলারদের সমস্যাটাই এখানে তুলে ধরছি।

আই, এফ, এ'র অধীনে প্রতি বছর ১৭০টি দল বিভিন্ন লীগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিটি দলে যদি কমপক্ষে ২০টি ফুটবলারের দরকার হয় তাহলে কলকাতার ফুটবলে প্রতি বছর সাকুল্যে ৩০০০ ফুটবলার অতি অবশ্যই প্রয়োজন। যেসব দলগুলি ফুটবলারদের শিক্ষা দেবার জন্য নিজস্ব মাঠ ও প্রয়োজনীয় অর্থ আছে—সব দল মিলিয়েও তারা ৫০০-র বেশী ফুটবলারকে এ সুযোগ কিছুতেই দিতে পারে না। বাকী আড়াই হাজার ফুটবলাব আসে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এ্যালেন ও বেঙ্গল সকার লীগের বিভিন্ন ক্লাবগুলি মারফৎ যাদের নিজস্ব মাঠ বলতে কিছু নেই, কোনও কোনও ক্লাবের ক্লাবরুম আছে কিনা সন্দেহ; আর শিক্ষা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের প্রশ্নটা উত্থাপন করাটাই বাতুলতা। কেননা অধিকাংশ ক্লাবই চলে একটি কি দুটি খেলা পাগল কিংবা ক্ষমতা-পাগল লোকের আর্থিক বদান্যতায়।

কাজেই আপনি এদের খেলা না দেখেও বোধহয় অনুমান করতে পারছেন যে এরা বিনা তালিমে কি মানের ফুটবল খেলে।

কিন্তু ট্র্যাজেডির ব্যাপার হল এইসব ফুটবলাররাই আজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, আধুনিক ফুটবলের মত জটিল স্কিলের খেলা উপযুক্ত কোচের কাছ থেকে না শিখে কিছুতেই বড় ফুটবলার হওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের যাত্রাপথ নাকি সমাজবাদের দিকেই। যতদূর জানি—বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য না, সুযোগ ও সুবিধাগুলো রাষ্ট্রের সকলের মধ্যে বণ্টন করাই এই মতবাদের মূলমন্ত্র। যদি তাই হয়, তাহলে শ্রদ্ধেয় তালুকদার মহাশয়,—পশ্চিমবঙ্গ স্পোরটস কাউনসিল ও আই. এফ এ-র সভাপতি হিসাবে জবাব দিন আপনারই স্পোরটস কাউনসিলের অধীনে স্থায়ী বেতনভুক ফুটবল কোচ থাকা সত্ত্বেও উত্তর, মধ্য, ও দক্ষিণ কলকাতা মিলিয়ে প্রায় ১৫টি ফুটবল খেলার মাঠ হতাশ নয়নে পড়ে থাকে কেন ?

সেখানে আপনার সংস্থা ইচ্ছা করলেই কি সকাল অথবা বিকালে, ফুটবল ট্রেনিং সেনটার খুলতে পারে না ?

একটা কথা আজকাল অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায় যে সংখ্যাই উৎকর্ষতার বাহক। কিন্তু সেটা পুরো সত্য নয় অর্ধসত্য।

এই যে কলকাতার ফুটবলাররা খেলা শেখবার সুযোগ না পেয়ে বছরের পর বছর খেলে চলেছে তারা সংখ্যার দিক থেকে বিপুল হতে পারে কিন্তু এই বিপুলতা যে খেলার মানকে উঁচুতে তুলতে পারেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমান বাঙলা ফুটবলের নীচু মান।

অথচ খেলাধুলোর উন্নতিকল্পে 'অবশ্য কর্তব্য' হিসাবে যে সমস্ত কাজগুলি আপনার অধীনস্থ সংস্থার এতদিনে করা উচিত ছিল যেমন :

(১) বিভিন্ন খেলাধুলোর আইনকানুন ও ক্রীড়া শিক্ষার উপর বই ছাপানো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিক খেলাধুলোর উন্নতিকল্পে যেসব কাজ হচ্ছে তারই খবর সম্বলিত মাসিক অথবা পাক্ষিক পত্রিকা বার করা।

(২) খেলার মাঠের সংখ্যা আরও অনেক বাড়ানো।

(৩) জিমন্যাসিয়াম, ইনডোর ষ্টেডিয়াম ও সুইমিং পুল গঠন।

(৪) খেলার আধুনিক সরঞ্জাম তৈরী করানোর বন্দোবস্ত।

(৫) স্পোরটস মেডিসিন কেন্দ্র চালু করা।

(৬) বিভিন্ন খেলায় প্রচুর কোচ নিয়োগ ও তাদের নিয়মিত কাজ করবার সুযোগের দিকে কঠিন নজর রাখা।

তার কোনটাই আজ পর্যন্ত এই রাজ্যে এখনো হয়নি বা হবার কোন চেষ্টাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। অথচ এগুলির সাহায্য ছাড়াই আমরা এখানকার খেলাধুলোর মান উপর দিকে তোলবার আশা করছি। এই মনোভাবকে অনেকটা বৈজ্ঞানিককে ল্যাবরেটরি না দিয়ে, তার কাছ থেকে নিত্য-নতুন আবিষ্কারের দাবির সঙ্গে তুলনা করা চলে।

বর্তমানে কোন খেলাই, খেলাধুলোর অন্য বিভাগের সাহায্য ছাড়া মান তুলতে পারে না। ফুটবলের কথাই ধরুন। ফুটবলারের দৌড়নোর সঠিক পদ্ধতি সহনশীলতা ও গতিবেগ বাড়ানোর জন্য যেমন অ্যাথলেটিক্‌সের, তেমনি পেশীর কো-অরডিনেশন আনবার জন্য জিমন্যাসটিক্‌সের শরণাপন্ন হতেই হবে। সেইসঙ্গে পরিশ্রমের চাপ কোন্ সময় কতটা ফুটবলারকে নিতে হবে তা নির্ধারণের জন্যও স্পোরটস-মেডিসিনের দ্বারস্থ হতে হবে।

আবার শিক্ষা যেখানে মানসিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ বয়স সেখানে বাধা নয়, কিন্তু ফুটবলের মত জটিল খেলা শেখার ক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে পেশী ও সেনসরী-মোটর ক্রিয়ারও সমভাবে প্রয়োজন—যাকে বলা হয়—স্কিল। সেখানে ১৪ থেকে ২০ বছর বয়সকে ফসল বোনবার উপযুক্ত কাল বলা হয়; এবং সেই অমূল্য কালটাতেই এইসব তরু খেলোয়াড়রা যদি নিজেদের তৈরী করবার সুযোগ না পায়; এবং যার ফলে ভুল শিখতে বা খেলতে বাধ্য হয় তাহলে উত্তর জীবনে সেই ভুল শুধরে, আবার নতুন করে সঠিক পদ্ধতি শেখান যে কি অসম্ভব ব্যাপার তা যে কোন অভিজ্ঞ ফুটবল কোচকে প্রশ্ন করলেই নিশ্চয় জানতে পারবেন।

তাই এই বিরাট অপচয়ের মূল স্রষ্টা হিসেবে আপনাকে ও আপনার অধীনস্থ দুটি সংস্থাকে যদি দায়ী করি তাহলে আপনি কি আমার এই অভিযোগ অস্বীকার করবেন?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পিছন থেকে একটার পর একটা কালো মেঘ উঠে আসছিল উত্তরের ঘেরা মাঠগুলোর দিকে। সেদিনের প্রথম ডিভিসনের ফুটবল খেলা আরম্ভ হতে তখনও আধ ঘণ্টা বাকি। ঝড়, বৃষ্টির আশঙ্কায় টেন্টে ভিতর ঢুকতে থমকে গেলাম। ভেতরে তখন তুমুল বচসা। একজন ফুটবলারকে সবাই মিলে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে কিন্তু সে কিছুতেই বুঝবে না। সমানে তারস্বরে চীৎকার করে বলছে "মজা পেয়েছ, ট্যাবলেট খাইয়ে এখন বসতে বলা হচ্ছে। আমি কিছুতেই বসব না। আমি খেলবই।"

একজন পরিচিত ফুটবলারকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে সে বলল, "দেখুন না, ঝড় জলের জন্য আমাদের একজন রেগুলার প্লেয়ার আসতে পারেনি বলে ওকে ড্রেস করতে বলা হয়েছিল—এখন সেই ছেলেটা এসে পড়েছে। এখন ওকে বসতে বলা হচ্ছে তা ও কিছুতেই বসবে না। প্রশ্ন করলাম, "তবে ও ট্যাবলেট খেয়েছি বলে চেচাচ্ছে কেন?" ছেলেটি ইতস্ততঃ করে বলল, "প্রত্যেক ভাইট্যাল ম্যাচেই আমাদের একরকম সাদা ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয়, ও সেইগুলোর কথাই বলছে।"

"দলেব সবাইকেই ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয়?"

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ"।

আমি প্রশ্ন করলাম, "ট্যাবলেটের নাম কি ডেক্সিড্রিন?"

ছেলেটি মুচকি হেসে বলল, "আপনিও জানেন দেখছি।"

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, আমি ওর হাত ধরে টেনে বললাম "এ জিনিস কি তোমাদের ক্লাবের ডাক্তার খেতে দেন?" ছেলেটি তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "আমাদের ক্লাবে ডাক্তার ফাক্তার কেউ নেই।

সেক্রেটারিই খেলার আধ ঘন্টা আগে যে যে প্লেয়ারকে এই ট্যাবলেট খেতে দেয় বুঝে নিতে হবে সেই প্লেয়ার সেই সেদিন খেলছে।"

বললাম, "এতে কি সুবিধা পাও কিছু।"

"হ্যাঁ, পুরো টীমটাই খেলার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে খেলে। আমাদের টীমকে নামাবার তো কতবার চেষ্টা হয়েছে তা পেরেছে একবারও ?"

সেদিন প্রথম ডিভিসনের ছোট টীমটা সত্যিই মহামেডান স্পোর্টিং-এর মত বড় টীমকেও হারিয়ে দিল। খেলার শেষে সব দর্শকই ছোট টীমটার খেলোয়াড়দের বিশেষ করে তাদের শারীরিক দক্ষতার, অফুরন্ত দমের এবং ক্লাবের প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রশংসা করতে করতে ধর্মতলার দিকে ফিরল। শুধু আমার মনটা ঐ ডেক্সিড্রিনের কথা ভেবে কেমন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বার বার মনে ভেসে উঠতে থাকল একটা ছবির কথা। এই ট্যাবলেটের কুফল সম্পর্কে আমার তখন অবশ্য কোন ধারনাই ছিল না। শুধু জানতাম এগুলো শরীরকে খেলায় সারাক্ষণ চাঙ্গা করে রাখে। খড়গপুরে ইন্টার-রেলওয়ে ফুটবল টোর্নামেন্টে, সাউথ ইষ্টার্ন রেলওয়ের খেলোয়াড়দের একবার এই ট্যাবলেট দিয়েছিলাম। খেলার পর সমস্ত রাত সব খেলোয়াড়ই জেগে। কারও চোখে ঘুম নেই কেবল হৈ-চৈ চেঁচামেচি। কেউ একটানা গান গেয়ে চলেছে কেউ বা বাথরুমে কল খুলে ঘনঘন মাথায় জল থাপরাচ্ছে। আমি সারারাত এই দৃশ্য দেখে অপ্রস্তুত ও মর্মাহত।

এর পরেও তু-একবার যে এ ট্যাবলেট আমি ব্যবহার করিনি তা নয় কিন্তু প্রত্যেকবারই খেলোয়াড়রা আমার কাছে একটু অনুযোগ করেছে যে তাদের শরীর এত উত্তেজিত হয়ে গেছে যে খেলার পর সারারাত ঘুমোতে পারেনি।

খেলায় যে মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি বা অবসাদ রয়েছে ওষুধ খাইয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাকে দূরে সরিয়ে রাখাকেই এক কথায়

ইংরাজীতে বলা হয় ডোপিং এবং এই কথাটা এসেছে ডাচ্ শব্দ 'ডুপেন' অথবা 'ডুপ' থেকে। এর আসল মানে যে কোন গাঢ় তরল পদার্থ যা শরীরে উত্তেজনা আনে। একশো বছরেরও আগে যে সব ডাচ্রা নিজের দেশ ছেড়ে আমেরিকায় বসবাস করতে আসে তারাই এই শব্দটি চালু করে। প্রথম প্রথম এই ওষুধটি রেসের ঘোড়ার উপরই প্রয়োগ করা হত যাতে তারা তীব্রবেগে দৌড়তে পারে। আমেরিকা থেকে ক্রমশঃ এটা ইয়োরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রচলন অবশ্য হাজার বছর আগেও চীনে ছিল।

যাই হোক গত মহাযুদ্ধই একে সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় করে তোলে। প্যারট্রুপ্স, কম্যাণ্ডোস ও পাইলটদের ভিতর এই ওষুধগুলোর ব্যবহার প্রচুরভাবে হত। জার্মান পাইলটরা এর নাম দিয়েছিল চকোলেট ডিনামাইট।

কি কি ওষুধকে 'ডোপে'র পর্যায়ে ফেলা হবে মেডিকেল কমিশন তাও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে একে তিনটে ভাগে ভাগ করে দিয়েছে :

(১) এ্যাসফেটামাইন, এফিড্রিন এবং ঐ জাতীয় প্রডাক্ট্স।

(২) আমাদের স্নায়ুকেন্দ্রকে উত্তেজিত করে এমন ওষুধ ; যেমন: ষ্ট্রেকনিন, এ্যানালেপটিক্স এবং ঐ জাতীয় পদার্থ।

(৩) নারকটিক্স আমাদের স্নায়ুকেন্দ্রকে অবদমিত করে ; যেমন : মরফিন, মেথিডিন, আফিঙ, প্রভৃতির সমজাতীয় পদার্থ।

ইয়োরোপে বিশেষ করে ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন ও বেলজিয়ামে পেশাদার সাইক্লিষ্টদের ভিতর এই ডোপের ব্যবহার অনেকদিন আগে থেকেই চলে আসছে। ১৯৫৭ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ সাইক্লিষ্ট টমি-সিম্পসন এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের বলেছিলেন "পেশাদার ক্রীড়াবিদদের সাফল্যলাভের জন্য স্নায়ুতে উত্তেজনা জোগায় এমন কিছু ওষুধ ব্যবহার করতেই হবে।" ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে এই বিবৃতির ঠিক দুই বছর পরেই 'ট্যুর দ্য ফ্রান্স' প্রতিযোগিতার মাঝ-খানেই তিনি মারা যান।

যাতে এই পৃথিবীখ্যাত প্রতিযোগিতার বদনাম না হয়, ডাক্তাররা তাই অন্য কারণ দেখিয়ে ব্যাপারটা চাপা দেন কিন্তু তার পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল—এ্যামফেটামাইন গ্রুপের এমন কিছু ওষুধ যা সাধারণ লোককে মর্মান্তিক মৃত্যু শুধু খেলোয়াড় মহলকেই নয় পৃথিবীর সমস্ত ক্রীড়ামোদীদেরও একদিকে যেমন বেদনায় হতবাক করে দিল তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সজাগও করে দিল যে ভবিষ্যতে আর এমন ব্যাপার চলতে দেওয়া উচিত নয়।

সিম্পসনের ছবি কেন ছাপা হল

সাহিত্যিক বন্ধু প্রশ্ন করলেন, "আগের লেখার সঙ্গে মুমূর্ষু ও মৃত সাইক্লিষ্টের ছবিটা বাদ দিলে ভাল হত না? পাপের শাস্তির হরেক রকম ছবি ছাপিয়ে কি পাপ কাজ বন্ধ করা গেছে?

বললাম, "আমি ধর্মপ্রচারক নই যে নরকের ভয় দেখিয়ে পুণ্য কাজ করিয়ে নেব। আসলে ডোপিং-এর ফলটা কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে তারই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে খেলোয়াড়দের বিচার বুদ্ধি বোধকে সজাগ ও সতর্ক করার চেষ্টা করেছি। পরের লেখায় যে ছবিটি থাকবে সেটি হোল এক পেশাদার মুষ্টি যোদ্ধার। মৃত্যুর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে তোলা এবং তারও মৃত্যুর কারণ ডোপিং। এ ব্যাপারে আমার ভয় কি জান—ওদের দেশে গতকাল যা ঘটেছে আজ আমাদের দেশে অল্প বিস্তর ঘটলেও আগামী দিনে আরও বেশী করে ঘটবে। ওদের দেশে অর্থের প্রাচুর্য্য আছে। খেলার পর মেডিকেল কমিশন খেলোয়াড়ের মূত্র ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেয় —ডোপিং হয়েছে কিনা। চরিত্র থেকে নীতিকে আজও সম্পূর্ণ মুছে ফেলেনি বলে ওরা খেলোয়াড়কে শাস্তি দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না। যেমন বেলজিয়ম ও ফ্রান্স ১৯৫৭ সালেই ডোপিংকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আইন প্রনয়ণ করেছে। আর আমাদের দেশে না আছে টাকা আর না আছে নীতি! ওটাত স্কুলের ছেলেদের রচনা লেখবার জন্য।"

বন্ধু বললেন, "তোমার উদাহরণগুলো সব পেশাদারদের নিয়ে। রুজি রোজগারের তাগিদে এ জাতীয় ওষুধ তাদের পক্ষে ব্যবহার করা খুব অসম্ভব নয়। শিল্পী সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও এর ভুরি ভুরি নজীর আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কিংবা অলিম্পিকে যেখানে খেলা-

মাউথ টু মাউথ রেস্পিরেশন দিয়ে সিম্পসনকে বাঁচাবার শেষ প্রচেষ্টা।

সিম্পসন মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েছেন।

এমনি ক'রেই ফুটবল ছড়িয়ে পড়ল………

খেলায় খালি অপেশাদাররাই যোগ দিতে পারে সেখানে এগুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে কি? আর ভবিষ্যতে যদি এ দেশেও এরকম ঘটনা বেশী ঘটে তাহলে আমরাও মেডিকেল কমিশন বসাব। এতে কি খুবই খরচ?"

বললাম, "১৯৫৭ সালে গ্রেনোবলের উইনটার অলিম্পিকে ৮৬ জনকে পরীক্ষা করতে অলিম্পিক কমিটির খরচ পড়েছিল প্রায় ৩০,০০০ টাকার মত। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিক চলাকালে ড্যানিশ সাইক্লিষ্ট ন্যূড জেনসেন যখন মারা গেলেন এবং তাঁর ট্রেনারও স্বীকার করলেন যে তিনি তার দলের সবাইকেই 'রনিকল' নামের ডোপিং ট্যাবলেট দিয়েছেন, তখনই অলিম্পিক কমিটিতে হৈ চৈ পড়ে গেল।

যে আভেরি ব্রানডেজ এ সমস্ত অলীক কল্পনা বলে আগে বিবৃতি দিয়েছিলেন তিনিও শেষ পর্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন "ষাট বছর ধরে এই স্পোর্টসের সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি আমার অভিজ্ঞতার পাতায় এ এক আনকোরা তিক্ত সংযোজন। ১৯৬৪ সালে ডোপিং টেষ্ট সম্ভব না হয়ে উঠলেও ১৯৫৭ সালে মেকসিকো অলিম্পিকে তা শুরু হয়ে গেল।"

বন্ধু—"এতে কি কেউ ধরা পড়েছিল?"

আমি—"হ্যাঁ, মাত্র একজন। সুইডেনের পেনটাথলন চ্যামপিয়ন-হান্স লিলি-জেকভিস্ট এবং এরজন্যে তার মেডেলটিও হারাতে হয়েছিল।

বন্ধু—"তোমার উদাহরণগুলোর ভেতর ফুটবলারদের খুঁজে পাচ্ছি না কেন? তারা কি এ সবের বাইরে, না বিদেশে ফুটবলারদের ডোপিং করা হয় না?"

বললাম—"তা কেন! ১৯৫৭ সালে ইংল্যাণ্ডে ওয়ারলড কাপের খেলায় ইটালি উত্তর কোরিয়ার কাছে হেরে যাবার পর তাদের বহু ফুটবলার দেশে ফিরে অফিসিয়াল ষ্টেটমেণ্ট দেয় যে তাদের হারার মূলে রয়েছে কতকগুলো ট্যাবলেট যা তাদের ডাক্তার এবং কোচ

খেলার আগে তাদেরকে গিলতে বাধ্য করে। এর ফলে খেলার সময় হঠাৎ তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই বিবৃতির ফলে ইটালির জাতীয় কোচ এডমনড ফ্যাব্রী তার চাকরীটা হারালেন। কিন্তু এতেও ইটালির ফুটবলে ডোপিং বন্ধ হল না।

ইতালি ফুটবল সংস্থা এক লীগের খেলায় নাপোলি এফ, সি'র ফুটবলারদের ডোপিং টেষ্ট করতে গিয়ে দেখল উক্ত ক্লাবের প্রায় সব ফুটবলারকেই ডোপ করা হয়েছে ; এবং এরপরই সংস্থা আদেশ জারী করল যে, যদি ফুটবলার 'ডোপ্ড' প্রমাণিত হয় তাহলে সেই খেলোয়াড়ের খেলোয়াড়ী জীবন খতম করে দেওয়া হবে অথবা তাকে প্রচুর টাকা জরিমানা দিতে হবে।"

১৯৪৮ সালে আমি যখন গড়ের মাঠে প্রথম ডিভিসন ফুটবল খেলতে আসি তখন দেখতাম ছোট ক্লাবের সঙ্গে বড় ক্লাবের অর্থাৎ মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল অথবা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলায় খেলোয়াড়দের একটু করে ব্রাণ্ডি অথবা একসট্রা নম্বর ওয়ান খেতে দেওয়া হত খেলার আগে অথবা বিরতির সময়। এ থেকেই যে খেলোয়াড়দের মদ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠত সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েও লক্ষ্য করেছি এ খাওয়াতে শরীরটা চাঙ্গা হত খেলার শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি বোধ থাকত না এবং মনের ভয়টাও খানিকটা চাপা থাকত।

সেবার বি. এন. আর-এ খেলি। গায়ে জ্বর থাকায় এবং বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর ভিজে যাবার আশঙ্কায় একটা বড় খেলা খেলতে চাইনি। ক্লাবের কর্ম কর্তারা আমার আপত্তি নাকচ করে ক্যালকাটা ক্লাবের বারে নিয়ে গিয়ে খানিকটা ব্রাণ্ডি অথবা হুইস্কি জাতীয় মদ খাইয়ে দিলেন। খেলার সময় দেখি আমি অন্য মানুষ। শরীর থেকে ক্লান্তি আর অবসাদ অবলুপ্ত। বুনো শুয়োরের মত সারা মাঠ চষলাম। শেষ বাঁশি যখন বাজল তখনও মনে হচ্ছে 'এর মধ্যে খেলা ফুরিয়ে গেল।' কিন্তু খেলার পর যত সময় যেতে লাগল ততনেতিয়ে পড়তে লাগলাম। বাস থেকে নেমে বাড়ী ফেরবার অল্প রাস্তাটুকুও মনে হল যেতে পারব না। ক্লান্তি আর অবসাদের বোঝা কাটাতে আমার সেবার দিন সাতেকের মত লেগেছিল।

আত্মীয় ডাক্তারবাবু ধমকেছিলেন "ফের যদি শুনি, ঐসব খেয়ে ফুটবল খেলেছ, তাহলে তোমার মাকে বলে তোমার ফুটবল খেলাই বন্ধ করে দেব।" গোঁড়া পরিবারে ঐ ধমকটুই ছিল যথেষ্ট।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে সারা পৃথিবীতে স্পোর্টস ও খেলাধুলো নিয়ে যে মাতামাতি সুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এখনো বড়-রকমের কোন যুদ্ধ না ঘটায় তা এক্কশো গুন বেড়ে আজ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অঘোষিত আত্মমর্যাদার লড়াইতে রূপ নিয়েছে। তাই এই আসরের পিছনে দেখতে পাই বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, অভিজ্ঞ কোচ, এমনকি সাংবাদিকদেরও একনিষ্ঠ গবেষণা। সবাইকারই এক লক্ষ্য —ওয়ারলড রেকর্ডকে চুরচুরিয়ে ভেঙে, নতুন ওয়ারলড রেকর্ড করা। একবার বিশ্বকাপ জিতে সন্তুষ্ট না হয়ে পর পর তিনবার জেতা। তাই দুঘণ্টার খেলায় এক মিনিটের জন্যও ফুটবলারের অভিধানে-'থামা' বলে কোনো কথা থাকছে না।

স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশেও এই আত্মমর্যাদার ব্যাপারটা দিন দিন সংক্রামক রোগের মত দ্রুত বেগে বেড়েই চলেছে। জীবনের চারদিকে যত হারছে খেলার মাঠের জেতাটাকে তত প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছি।

সচ্ছল দেশের খেলোয়াড়দের উত্তরোত্তর সাধ্যের সীমাকে বাড়াতে এবং তাকে নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তি অবসাদহীন করবার জন্যে খেলোয়াড়দের দৈনিক খাদ্য তালিকায় রয়েছে আজ ৪০০০ ক্যালরীর সুষম খাদ্য। প্রতিদিন আট থেকে দশ ঘণ্টা পূর্ণ বিশ্রাম। সেই সঙ্গে পেশাদার-দের ক্ষেত্রে রাশি রাশি টাকা। অস্টপ্রহর তাকে ঘিরে বসে আছে স্পোর্টস ডাক্তার থেকে মনের ডাক্তার পর্যন্ত। প্রতিযোগিতার আগে ব্যবহার করা হচ্ছে ডাব্‌ল প্রোটিন, ভিটামিন বি-১২, বি-২, ক্যালসিয়াম ও গ্লুকোজ ইনজেকসন। প্রতিযোগিতা চলাকালীন সল্ট ট্যাবলেট, সরবতি লেবুর রস, গ্লুকোজের সঙ্গে মধু মিশিয়ে, এগ-ফ্লিপ্‌স আরও কত কি! বলা বাহুল্য এগুলো কোনোটাই 'ডোপ' নয়। উপরন্তু এগুলো খেলোয়াড়ের দেহে দরকারী অতিরিক্ত এ্যানার্জি জোগায়।

১৯৩৬ সালের অলিম্পিকে জাপানী সাঁতারুরা প্রতিযোগিতার

আগে অক্সিজেন সিলেণ্ডার থেকে অতিরিক্ত অক্সিজেন নিয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত দেহে যে অতিরিক্ত অক্সিজেনটুকুর দরকার লাগে আগে থাকতে সেইটুকু নেওয়া থাকলে শরীর আর ক্লান্ত হবে না। তাই দেখে পৃথিবীর অন্য সাঁতারুরাও অক্সিজেন নিতে সুরু করে দেয়। কিন্তু কোনোও কাজে আসে না বলে এই পদ্ধতিটি পরে বাতিল হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫৩ সালের আই. এফ. এ শীল্ড-ফাইনালের কথা মনে পড়ে। দেরী হয়ে গেছল বলে তাড়াতাড়ি ড্রেসিং রুমে ঢুকেই থ। আপ্পারাওয়ের মুখে ফানেল আর পায়ের কাছে বিরাট এক অক্সিজেন সিলেণ্ডার। খেলার শেষে জিজ্ঞাসা করলাম "কি রকম লাগল সিনিয়ারএ নিয়ে খেলতে।" মুচকি হেসে সিনিয়ার ওরফে আপ্পারাও রসিকতা করে বলল "শেষ দিনে তো নিতেই হবে তারই একটা ট্রায়াল দিয়ে রাখলাম।"

সেদিন ডাক্তার বন্ধু মানব মুন্সীর চেম্বারে বসে আছি। দেখি উনি পর পর দুটো রিকেটি বাচ্চাকে ইনজেকসন দিচ্ছেন। ঠাট্টা করে বললাম ইনজেক্সনের ঐ সরু নিডল দিয়ে ম্যালনিউট্রিশনের মত বিরাট রাক্ষসটাকে আর কতদিন রুখবেন?"

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, "এই বছরের ইউ. এন. ও-র জাতীয় সমীক্ষার রিপোরটে লিখছে, 'এই হারে খাদ্যের অভাব থাকলে আগামী বিশ বছরে ভারতে মস্তিস্কের দৈন্যতা অবশ্যম্ভাবী।' আর এরাই তো বড় হয়ে খেলার মাঠে খেলতে যাবে। আর এদের নিয়েই সকলে স্বপ্ন দেখবেন পেলে-ইসোবিওর।"

একটু থেমে বললেন, "ছোটবেলা থেকে আমি খেলোয়াড়দের সঙ্গে মিশছি। ডোপিং যে এদেশে বাড়বে আপনার সঙ্গে আমিও একমত। এই দারুন গরমের দেশে ৭০ অথবা ৯০ মিনিট তাও সপ্তাহে তিনটি খেলতে গেলে শরীরের যে নিউট্রেশান দরকার তা কোথায়? বড় দলের খেলোয়াড়েরা তবু খানিকটা নারিশমেণ্ট পায়।

কিন্তু ছোট ছোট দলের সেই তরুন উঠতি খেলোয়াড়দের নিউট্রেশান বলতে তো সেই মুসুরীর ডাল। কাজেই তারা যদি এই অমানুষিক এবং অস্বাভাবিক খেলায় নিজেদের উজ্জ্বল তারকা করতে গিয়ে অন্ধকারের এই ডোপিং-এর রাস্তা ধরে বা তাকে ধরান হয় তাহলে আমাদের বলবার অধিকারই বা কি আছে? যারা এইসব ৯০ মিনিটের উদ্যোক্তা তারা সব নন্-টেকনিক্যাল লোক। তাদের খেয়ালের বলি হবে এইসব হাড় জিরজিরে তরুণ খেলোয়াড়েরা।"

আমি চুপচাপ বসে আছি দেখে উনি আবার মুখ খুললেন, "আপনার লেখার কিন্তু একটা ভাইট্র্যাল পয়েন্ট বাদ পড়ে গেছে।" আমি প্রশ্ন করলাম, "যেমন?"

"কোন খেলোয়াড় যদি পরিমিত ডোজে দীর্ঘদিন ডোপ ব্যবহার করে তার শরীরের পরিনতি কি ধরনের হবে?"

আমি এ নিয়ে যে ভাবিনি তা নয়। আমার পক্ষে মুসকিল হচ্ছে এ নিয়ে আমাদের দেশে কোন আলোচনা বা রিসার্চ হয়নি বা আমার চোখে পড়েনি। তার ওপর আমি ডাক্তার নই। একটার বেশী আমার হাতে কেস হিস্ট্রিও নেই, আমার পক্ষেও আলোচনা সম্ভব হয়নি।"

ডাক্তার এবার উৎসুক কণ্ঠে বললেন, "শুনি আপনার কেস-হিস্ট্রি।" আমি বললাম, "কৃপাল সিং-এর নাম শুনেছেন কি না জানি না, এত বড় ডিসট্রেন্স রানার কিন্তু ভারতে এখনও জন্মায়নি। ওর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সালে ৫০০০ মিটারে এশিয়ান রেকর্ড ভেঙে নূতন এশিয়ান রেকর্ড করা।

সালে দিল্লীতে পাহাড়গঞ্জে প্রি-ওলিম্পিক ট্রায়ালের দশ হাজার মিটার দৌড়ে ২৪ পাক পর্যন্ত আশ্চর্য তীব্র গতিবেগে আসছিল। কিন্তু শেষ পাকের গোড়াতেই ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। চোখ করমচার মত লাল। বিড়বিড় করে অশ্রাব্য ভাষায় সকলকে গালাগাল দিচ্ছে। এই পড়ে যাওয়া এবং এই লক্ষণগুলো যে

ডোপিং-এর তা কৃপাল সিং নিজেই পরে স্বীকার করেছিল। বলেছিল 'নতুন রেকর্ড করবার তাড়নায় আমি ডবল ডোজ 'ষ্টিমুল্যাণ্ট' ট্যাবলেট ব্যবহার করেছি।' দুঃখের কথা, তারপর থেকে কৃপালকে আজ পর্যন্ত ট্রাকে আর দেখা যায় নি। ডাক্তাররা অবশ্য তাকে এক বছর পুর্ণ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিয়েছে।"

আমাকে চুপ করতে দেখে ডাক্তার একটু কিভেবে বলতে শুরু করলেন "দেখুন প্রকৃতিতে সব কিছুই চলছে ছন্দে। আর এই ছন্দ মানেই গতির সঙ্গে বিরতি। যে হৃদপিণ্ড জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম একটানা কাজ করে সেও বিশ্রাম নেয় যখন আমরা বিশ্রাম নিই বা ঘুমাই। শুধু হৃদপিণ্ডের ক্ষেত্রেই নয় শরীরের সমস্ত কোষের বেলাতেও এ কথা খাটে।

একটা শক্ত লোহাও ভাঙবে যদি তাকে অনবরত আঘাত করা হয়। অপরিমিত ডোপও তাই হৃদপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক বাড়িয়ে তাকে অচল করে দেয়। পরিমিত ব্যবহারে রক্তের চাপ বৃদ্ধি আবার সঙ্গে সঙ্গে চরম দৌর্বল্য। সেই সঙ্গে অনিদ্রাজনিত স্নায়বিক শৈথিল্য। স্নায়ুর এসিটিলকোলিন রসের নির্গমনের ব্যবস্থা ব্যহত হওয়া। লিভারের কোষ শুকিয়ে সিরোসিস অব লিভার পর্যন্ত হতে পারে। কিড্নী ডিপ্রেস্ড হয়ে রক্তে মুত্রের পরিমাণ বাড়াবে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো আজকের ছাত্রছাত্রীরা বাজার থেকে নিজে নিজেই মুড়ি-মুড়কির মত 'রিটালিন' ট্যাবলেট কিনে পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়াশুনো করছে। তার ফলে অধিকাংশই গ্যাসট্রাইটিসের শিকার হচ্ছে।"

গভীর রাতে একলা বাড়ী ফেরবার পথে মনে হলো এত জানার পরও ফুটবলার ভবিষ্যতে ডোপিং ট্যাবলেট খেতে রাজী হবে। না আমার এ লেখা ওয়েষ্ট পেপার বাক্সে অনেক ছেঁড়া কাগজের মাঝে হারিয়ে যাবে।

মামুলী চিঠি

পোস্ট কার্ডটা আমাকে লেখা হলেও ক্লাব টেন্টের ঠিকানায় এসেছে বলে সঙ্গে সঙ্গেই পাইনি। হাতে যখন পেলাম তখন মাঝখানের সাতটা দিন পার হয়ে গেছে। মর্ণিং প্র্যাকটীশ শেষ করে উঠতে উঠতেই সেদিন এমনিতেই নটা বেজে গেল তার উপর বৈশাখের কাঠ ফাটানো চিরচিরে গরম। স্নান সেরে রাস্তায় বেরিয়েই মনে হলো পোস্ট কার্ডটা এখনও পড়া হয়নি। পকেট থেকে পোস্ট কার্ডটা বার করে হাঁটতে হাঁটতেই পড়া সুরু করে দিলাম। কিন্তু দুই এক লাইন পড়তে না পড়তেই কখন যে ইডেনের গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। লেমনেড ওয়ালা রামলাল আমার চেনা লোক। আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে ডাক দিয়ে বলল, "বাবুজী, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? আপনি আমার এই টুলটায় বসে চিঠিটা পড়ুন। যা গরম পড়েছে!"

আমাকে কিছু বলতে না দিয়েই ও টুল থেকে নেমে এক মাড়োয়াড়ী খদ্দেরকে কোকো-কোলা দেবার জন্য বরফ ভাঙতে গেল। টুলটার উপর বসে আমি আবার গোড়া থেকে চিঠিটা পড়তে সুরু করে দিলাম। চিঠির অক্ষরগুলো ছোট ছোট হলেও বেশ স্পষ্ট আর গোল গোল।

শ্রদ্ধেয় অমলদা,

আমি বিষ্টু। বছর চার পাঁচ আগে টাকীর এরিয়ান মাঠে সেই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এর মাঝে অনেকবার ভেবেছি আপনার সঙ্গে দেখা করব কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। প্রথমত আপনি তিন বছরের জন্য কটকে চলে গেলেন তারপর কলকাতা এসে বড় টিমের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাতদিন এমনই ব্যস্ত থাকেন যে

এর মধ্যে আপনাকে গিয়ে আবার বিরক্ত করতে আর ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু অমলদা, আর আপনাকে বিরক্ত না করে পারছি না। গতবার আপনি যখন টাকী এসেছিলেন তখন আপনাকে আমার বাড়ীর অবস্থা দেখিয়েছিলাম। তখনকার ভগ্ন এবং জীর্ণ সে বাড়ীর অবস্থা আজ আরও শোচনীয়, বাসের অযোগ্য। বর্ষার সময়টা তিন বৌ ছেলেপুলে নিয়ে জেগে সারারাত বসে থাকতে হয়। বাবা এতদিন চাকরী করছিলেন তিনিও আগামী সালে রিটায়ার করছেন। সারা পরিবারের ঐ একমাত্র আয়ের পথটাও বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের অবস্থা যে কি হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারছি না। এদিকে আমার স্ত্রী বাবা নিত্য বলছেন আপনাকে অনুরোধ করতে, কেননা যদি কিছু হয় তবে তা আপনার দ্বারাই সম্ভব। আমার পা-এর অবস্থা যদি একটুও উন্নতি হতো তাহলেও না হয় মুটেগিরি করতাম কিন্তু ভগবান সে পথও মেরে রেখেছেন। সহায় সম্বলহীন এ ছোট ভাইয়ের কথা চিন্তা করে আপনি যদি আমার কোন চাকরীর একটা বন্দোবস্ত করে দেন তা যেখানেই হোক তাহলে নদীর স্রোতে খড় কুটোর মত ভেসে যাওয়া একটি পরিবার অন্ততঃ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবে।

আশা করি আপনি ও আপনার বাড়ীর সকলে ভাল আছেন ও আছে।

সশ্রদ্ধ প্রণামান্তে ইতি

বিষ্টু।

পুনঃ—এ চিঠির উত্তর না পেলে আপনার বাড়ী গিয়ে শেষ পর্যন্ত ধর্ণা দিতে হবে আমাকে। মোট কথা আপনাকে ছাড়ছি না।

১৯৫০-৫১ সালে কলকাতার গড়ের মাঠের তরুণ ও দারুণ সম্ভাবনাপূর্ণ রাইট উইঙ্গার বিষ্টু মুখার্জীর একটা ছবিই শুধু তখন আমার মনে ভাসছিল—চোট লেগে সিধে হয়ে যাওয়া ডান পাটাকে কোন রকমে টানতে টানতে লম্বা ছিপ ছিপে বিষ্টু—কর্পোরেশনের সেই বিখ্যাত লাল বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে। সারা মুখ জুড়ে

বিন্দু বিন্দু ঘাম। কর্পোরেশন থেকে ওর অস্থায়ী চাকরীটা খতম হয়ে যাওয়ার খবরটা আমি আগেই অন্য লোকের মারফৎ পেয়েছিলাম। তবু জিজ্ঞাসা করলাম "কি বিষ্টু, চাকরীটা বাঁচাতে পারলে?" কথা বলতে গিয়েও ও বলতে পারল না। কান্নায় ছলছলিয়ে ওঠা চোখ দু:টাকে রাস্তার দিকে নামিয়ে ও শুধু ঘাড় নাড়ল। আমরা দুজনেই অনেকক্ষণ মুখোমুখি ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না আর ওর কথা গেছে নিঃশেষ হয়ে।

সারা ফুটপাথ জুড়ে তখন চলেছে কর্পোরেশনের কেরাণীবাবুদের দর কষাকষি। কেউ ডাব, কলা, মুড়ি আবার ওরই ভিতর কেউ সন্দেশের দর করছে। অশ্বস্তিকর সেই হৈ চৈ পরিবেশ থেকে ওকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য বললাম "চলো বিষ্টু, আনজাদিয়ায় গিয়ে বসি। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে আর তোমারও নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।"

বিষ্টু আপত্তি করল না, খোঁড়া পাটাকে টানতে টানতে আমার সঙ্গে হোটেলে গিয়ে ঢুকল। কেবিনে বসতে না বসতেই বয় পাখাটা চালিয়ে দিয়ে দু'গ্লাস ঠাণ্ডা জল দুজনের সামনে রেখে গেল। এক নিঃশ্বাসে জলের গ্লাসটা শেষ করে ঠক্ করে সেটাকে পাথরের টেবিলটার উপর রাখল বিষ্টু। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁটটা মুছতে মুছতে রাগে ফেটে পড়ল। বিষ্টু—"একবছর আগে ঐ কর্পোরেশন ক্লাবের কর্মকর্তারা আমাকে কি খাতিরটাই না করছিল। আর আজ ওরা আমাকে চিনতে পারল না। আপনি ত জানেন আমি তখন বি. এন. আর-এ খেলি এবং ওখানে চাকরীও করি। আমার রেলের চাকরা ছাড়বার মোটেই ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ঐ প্রেমাদা আমাকে ভাঁওতা দিয়ে ওর ক্লাবে সই করাল এই কর্পোরেশনে একটা অস্থায়ী চাকরী জুটিয়ে দিয়ে বলল "রেলে খেললে তুমি কোনদিন বাঙলা বা ইণ্ডিয়ার হয়ে খেলতে পারবে না বিষ্টু, আমার টিমে খেলে দেখো ঐ দুটোতেই তোমাকে চান্স করে দেব। আর তাছাড়া এ চাকরী তোমার রেলের চেয়েও ভাল।"

আমি প্রশ্ন করলাম—"তুমি ওর কথা বিশ্বাস করলে কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এবার ও যেন ঝিমিয়ে গেল। বলল—"বিশ্বাস করে-তাই ত আজ সারা জীবনটা পস্তাব। হাঁটুর চোটের জন্য ছ'মাসের সার্টিফিকেট এনে ওনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনি আমার চাকরীটাই খতম হয়ে গেছে। আচ্ছা আপনিই বলুন তো অফিসে এবং আই. এফ. এ-তে যার এত হোল্ড সে কি ইচ্ছা করলে আমার মত এক চোট খাওয়া হতভাগ্য খেলোয়াড়ের এই শেষ অবলম্বন চাকরীটুকু বাঁচাতে পারতেন না। তা ছাড়া আমিও ওর টিমের হয়ে খেলতে গিয়েই চোট খেয়েছি। আসলে আমরা এই ফুটবলাররা আমাদের দেশের লোকেদের কাছে প্রষ্টিটিউট্স অর্থাৎ বেশ্যাদের মত। বেশ্যাদের যেমন যতদিন রূপ-যৌবন আছে ততদিনই তাদের নিয়ে মাতামাতি। রূপ-যৌবন চলে গেলে যেমন তাদের কেউ চেনে না নর্দমায় ফেলে দেয় আমাদেরও তেমনি যতদিন পায়ে খেলা আছে ততদিন আমরা নয়নের মনি। তারপর খেলা চলে গেলে বা পাটা ভেঙে গেলে আমরা কোথায় হারিয়ে যাই তাব খোঁজ কেউ রাখে না।"

বিষ্টুকে ভেঙ্গে পড়ার হাত থেকে বাঁচাতে প্রশ্ন করলাম—"যা হয়ে গেছে, তারজন্য আপসোস না করে, ভবিষ্যতে কি করবে তাই ভাব বিষ্টু। তোমার পা-এর বিষয়ে ডাক্তার কি বলেন? অপারেশন করলেও কি পা ভাল হবে না?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিষ্টু বলল—"পা আমার লক্ হয়ে গেছে এবং এ জাতীয় কেসে এখানে অপারেশন সাক্‌সেস্ ফুল হয়নি। ভিয়েনা কিংবা সোভিয়েটে যেতে পারলে হয়ত ওখানকার ডাক্তাররা কিছু করতে পারেন।"

আমরা দুজনেই চুপ করেছিলাম। শুধু মাথার ওপর পাখাটার একটা কিট্ কিট্ আওয়াজ নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চলছিল। বিষ্টু যেন অতীতে হারিয়ে গেছে।

মহামেডানের এগেনষ্টে প্রথম যখন হাঁটুতে লাগল তখনই এত

যন্ত্রণা হচ্ছিল যে আমি দাঁড়াতেই পারছিলাম না। আমাকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে আনতে হলো। আমি এরপর আর কিছুতেই খেলতে চাই নি। ক্লাবের কর্ম কর্তারা জোড় করে আমার হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ নিকাপ পড়িয়ে আবার আমাকে মাঠে নামাল। আর ঐ নামাটাই আমার কাল হলো। দ্বিতীয়বার হাঁটুতে লাগাতেই হাঁটুটা সিধে হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, তুমি যদি দ্বিতীয়বার মাঠে না খেলতে নামতে তাহলে এতদিনে তোমার হাঁটু ভাল করে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন আমরা তোমায় কোন আশাই আর দিতে পারছি না। আই অ্যাম সরি।"

আমি আশার একটা ক্ষীণ রেখা দেখে বললাম "তোমার হয়ে আমরা খেলোয়াড়রা যদি আই. এফ. এ-র কাছে বিদেশে যাওয়ার জন্য টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করি?"

আমার কথায় ও ম্লান হেসে বলল, "শুনেছি মেডিকেল কলেজে আই. এফ. এ-র নাকি দুটো বেড আছে। হাঁটুতে লাগার সময় কত চেষ্টা করেও একটা বেডই জোগাড় করতে পারিনি আর আপনি বলছেন-আই. এফ. এ দেবে অতগুলো টাকা!"

হঠাৎ দেখি রামলাল তার মুখটা আমার কানের কছে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করছে "বাবুজী কোই বুঢ়া খবর আছে এ ঘৎসে?"

আমি বললাম "বুঢ়া?"

রামলাল সমবেদনার স্বরে বলল "হাঁ, বাবুজী। আপুনি বহুৎ টাইম এ খৎ লিয়ে বোসে বোসে চুপচাপ কি ভাবছেন। ঔর কুছ বাত্ ভি আপনা মনসে বোলছেন।"

রামলালের চোখের সামনে তো আর ভিতরের দগ্‌দগে ঘাগুলোকে মেলে ধরা যায় না। তাই টেরিলিনের শার্ট-প্যান্ট পরা অমল দত্ত মুহূর্তেই সভ্য মানুষ হয়ে উঠল। হেসে বললাম "না, না, রামলাল ওসব কিছু নয়। এ একটা এমনি মামুলী চিঠি।"

ক্যাচ দেম্ ইয়াং?

ক্লাশের শুরুতেই চীফ কোচ মিঃ লিটলউড্ তাঁদের দেশের ফুটবল সমস্যা নিয়ে এমন এক আলোচনার অবতারণা করলেন, যে বিষয়ে বিন্দু বিসর্গও জানি না। মাস তিনেক ইংল্যাণ্ডে এসেছি। সে দেশের আবহাওয়া এবং ভাষাটাই তখনও ভালভাবে রপ্ত হয়নি সমস্যা ত দূরের কথা। ফেরার পথে যে বাসটায় চাপলাম সেটা আমার আস্তানার দিকে যাবে না। কাজেই মাঝপথে নেমে পড়তে হলো। ১৯৫৭-এর ডিসেম্বরের গভীর রাত। চারদিক শুনশান। ওভারকোটের কলারটা কান পর্যন্ত ঢেকে ক্যাম্পডেন টাউন থেকে হ্যাম্পষ্টীড্ হীথের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো ক্লাশের সদ্য আলোচনার কথা। ক্লাশে সবাই একমত বৃটেন আজ উঁচুদরের আন্তর্জাতিক ফুটবলার দিতে পারছে না এবং সেইজন্য আন্তর্জাতিক খেলায় ভাল ফলও হচ্ছে না। তার মূল কারণ খেলোয়াড় জীবনের শুরু থেকেই বৃটেনের ছেলেরা দক্ষ কোচের অধীনে খেলা শেখার সুযোগ পাচ্ছে না। স্কুলে যে সব পি. টি. মাষ্টার ফুটবল খেলা শেখান তারা নিজেরাই ফুটবল খেলায় অজ্ঞ। কাজেই ভুল এবং উল্টোপাল্টা শিখে বড় হয়ে এরা যখন ক্লাব-কোচের হাতে পড়ে— তখন কঞ্চি পেকে বাঁশ হয়ে গেছে। ভুল শেখাগুলো শুধরে নতুন করে শেখানোরও সময় আর থাকে না।

সোভিয়েট, ইটালি, স্পেন, হাঙ্গেরী কিংবা ওয়েষ্ট জার্মানীতে কিন্তু খেলা শেখানো হচ্ছে, গোড়া থেকেই দক্ষ কোচ অথবা অতীত দিনের নামকরা ফুটবলারদের দিয়ে। তাই ইয়োরোপীয়াণ কাপ এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলে এ দেশগুলোরই জয় জয়কার। ইংল্যাণ্ডের ফুটবল এসোশিয়েশন সেই দেখে উঠে পড়ে লেগে গেছে; কোচ

তৈরীর কাজে যাতে ছেলেরা গোড়া থেকেই দক্ষ কোচের অধীনে তালিম পায়!

হঠাৎ মনে ভেসে উঠল হারাধনবাবুর মুখটা। আমাদের স্কুলের গেম টীচার। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মাথা জোড়া টাক। লম্বা কাঠির মতন চেহারা। মিলিটারী ফেরত লোক হলেও বাতের ব্যথায় প্রায়ই ভোগেন। ড্রিল ছাড়াও উনি স্কুলে ইতিহাস ও ভূগোল পড়ান। একদম শেষের পিরিয়ডে আমাদের হতো ড্রিল। গোড়াতেই হারাধনবাবু চোখ পাকিয়ে বলতেন "বয়েজ, লাইনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে না। সিধে হয়ে দাঁড়াও। আমি চাই ডিসিপ্লিন। মনে রাখবে লেখাপড়া না শিখলেও চলবে কিন্তু ডিসিপ্লিন না শিখলে জীবনটাই বরবাদ।"

আমরা সিধে হয়ে দু মিনিট দাঁড়ালেই ওঁনার বাতেব ব্যথা বোধহয চাগাড় দিয়ে উঠত। বলতেন, "যাও তোমাদের ছুটি।"

স্কুলের না ছিল মাঠ না ছিল খেলাধুলোর সরঞ্জাম। টিফিনের সময় এক চিলতে উঠোনে আমরা কিত্ কিত্ খেলতাম। ইণ্টার-স্কুল লীগের আগে নিবারনবাবু আমায় ধরে নিয়ে যেতেন হেডমাষ্টারের কাছে। বলতেন "এই যে এনেছি স্যার অমলকে।" হেড স্যার গম্ভীরস্বরে বলতেন "দুচারটে ষণ্ডামার্কা ছেলে জোগাড় কর এবার। মিউ মিউ করে তো গতবার মনোরমা কাপের ফাইনালটায় হারলে।"

উনি জীবনে খেলার মাঠের ধারে কাছে যাননি। ওঁনার ধারনা ফুটবল খেলাটা একমাত্র মারপিট করনেওয়ালা ছেলেদেরই। আমায় নীরব দেখে বললেন, "তুমি তো এবারও ক্যাপটেন। স্কুলের মুখোজ্জ্বল করবার দায়িত্বটা সম্পূর্ণ তোমারই তো হে।"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "আজ্ঞে চার পাঁচটা জোগাড় করেছি। তবে বড্ড দাঁড়ি-গোঁফ। ধরা পড়ে যেতে পারি স্যার।" উনি আমার কথা আমল না দিয়ে বললেন, "দুবেলা কামাতে বল ওদের। ব্লেড আমি সাপ্লাই করব।"

আমি বললাম, "ওরা বলছে, স্যার, এবার খেলার পর শুধু লেমনেড দিলেই চলবে না। সেই সঙ্গে অনাদির মোগলাই পরটা আর কষা মাংসও খাওয়াতে হবে।"

কয়েকজন সহ-খেলোয়াড় পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল। হেডমাষ্টার মশাই তাদের ধমক দিয়ে বললেন "এই, তোরা ওখানে কি করছিস পালা সব ওখান থেকে।" উৎসুক মুখগুলো সরে যেতেই আমাকে আরও তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা তাই হবে। তবে শুধু তোমাকে আর ঐ গোঁপ দাড়িওয়ালা ছেলে-গুলোকেই দেওয়া হবে।"

আমি মাথা নেড়ে চলে আসছিলাম। উনি আবার গলা নামিয়ে বললেন, "দেখো, আর সব খেলোয়াড়রা যেন এই খবর জানতে না পারে।"

সীমাবদ্ধ

পনেরো ষোলো বছর আগে, যখন নিদাঘের তীব্র রোদে একা একা দেশবন্ধুপার্কে ফুটবল-অনুশীলন করতাম হস্বাকৃতি, বছর দশেকের একটি ছেলে সারাক্ষণ ছায়ার মত আমায় অনুসরণ করত। ওখানকার দু-একজনের মুখে শুনেছিলাম ছেলেটি নাকি দারুন ক্যাম্বিস বল খেলে। বাড়ীর অবস্থা ভীষণ খারাপ। লেখাপড়া করে না বললেই চলে। সারাদিন এ পড়ায় ওপাড়ায় খেলেই বেড়ায়। আমাকে অবশ্য ছেলেটি নিজমুখে কিছু বলেনি কোনদিন। একমাত্র খেলা শেখানোর জন্যে অনুরোধ করা ছাড়া।

তারপর বেশ কয়েকবছর ওদিকে যেতে পারিনি। শুনেছিলাম —ছেলেটি গয়ায় রেলের ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়ার চাকরী করছে।

শীতের এক দুপুরে, ঐ দেশবন্ধু পার্কেই বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা দেখছি হঠাৎ প্রায় ছ'ফুটে এক তাগড়াই ছেলে পিছন থেকে পায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলাম। গুরুগম্ভীর গলায় ছেলেটি প্রশ্ন করল "চিনতে পারেন?"

সেদিন তাকে চিনতে আমার একটু দেরীই হয়েছিল বটে। জিজ্ঞাসা করলাম "খেলছ নাকি কোথাও?"

ছেলেটি বলল "হ্যাঁ। এরিয়ান্স ক্লাবে। কি ভুল-টুল হচ্ছে ঠিক ধরতে পারছি না। একটু শুধরে দিন না।"

আমায় নীরব থাকতে দেখে, ও শুধু বলল "আপনার বাড়ীতে একদিন যাব।"

তারপর ধাপে ধাপে ও উঠে গেল। ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান। বাঙলা ও ভারতের হয়েও দেশে-বিদেশে খেলল। কয়েকবার কলকাতার লীগে সর্বোচ্চ গোল দাতাও হল। একদিন আমার

ঘরে অকপটে আনন্দবাজার পত্রিকার মাঠ-ময়দানের কালকেতুকে যখন ও বলল "জানেন, আমি যখন এরিয়ান্সে খেলি, তখনও হাওড়া স্টেশনে, সকলের সামনেই খালাসীর হাফপ্যাণ্ট পরেই বিরাট সিঁড়ি ঘাড়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। সাকুল্যে সেদিনে মাহিনা ছিল আমার একশো টাকার কাছাকাছি।" তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতেও, সত্যভাষণে ওর দুর্জয় মনের জোড় দেখে, আমায় ঘুড়ে দাঁড়াতে হয়েছিল।

আর একবার ওর মনের জোর দেখলুম ১৯৬৮ সালে। আমি তখন ওড়িশার ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে কোচিং করে বেড়াচ্ছি। ও চিঠি লিখল "কেন খেলতে পারছি না ঠিক বুঝছি না। সিজনের গোড়ায় এক মাস আপনার কাছে অনুশীলনের অনুমতি দিন।"

ওড়িশার সাউথ বালাণ্ডা কোলিয়াড়িতে গরম তখন ১১২ ডিগ্রীর ওপর। ওখানকার যে মাঠে ক্যাম্প চলছিল সেখানে ঘাসের ছিঁটে ফোঁটাও নেই। বালি আর বালি। এ মাঠে অল্পক্ষণ খেললেই ক্লান্তি জড়িয়ে ধরে। দিনে চার পাঁচ ঘণ্টা অনুশীলনের পর ছিল নিজেদের রান্না করার কাজ। এক মাস একটানা এই ধরনের খাটুনীতে মাঝে মাঝে ও ককিয়ে উঠত না, এমন নয়।

ওখান থেকে ফিরে ১৯৬৯ সালের লীগের গোড়ার দিকের কয়েকটি মাত্র খেলায় ও যখন পর পর দশটা গোল করে বসল তখন সবাই সমস্বরে বলতে সুরু করল "অসীম মৌলিক আবার পুরনো ফর্ম ফিরে পেয়েছে।"

অপমৃত্যু !

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের পরিবেশটা ছিল কেরানী গড়বার আদর্শ। সেখানে খেলাধুলো কেন, গান-বাজনা, সাহিত্য, শিল্পচর্চা মানুষের সবকিছু সুকুমার বৃত্তির উপরই ছিল সমাজের বিরূপ মনোভাব। অর্থাৎ ওগুলোর অনুশীলন ছিল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথ।

সেই চল্লিশ বিয়াল্লিশ সালে রথীন আমার বন্ধু এবং সহপাঠীই শুধু নয় সহ-খেলোয়াড়ও ছিল। অল্প বয়সেই বড় ফুটবলারের লক্ষনগুলো ওর খেলার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। ওকে নিয়ে তাই আমার এবং আমাদের স্কুলের অনেকেরই অনেক আশা ও স্বপ্ন ছিল।

সেবার ইণ্টার ক্লাশ টোর্নামেণ্টে ক্লাশ টেনের সঙ্গে খেলা। শুনলাম রথীন খেলতে পারবে না। ওর বাড়ী গিয়ে দেখি ও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, গায়ে বেশ জ্বর। আমায় চিন্তিত দেখে ও ফিস্‌ফিস্ করে বলল "তুই ঘাবড়াস না, কাল ঠিক খেলব।"

ওর প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে বললাম "তোর মা হরদম এ ঘরে আসছেন, তুই বেরোবি কেমন করে?"

লম্বা পাশ বালিশটার উপর কম্বলটা বিছিয়ে ও বলল: "এমনি করে ধোঁকা দিয়ে।"

পরদিন খেলায় জিতে, আমরা যখন নাচানাচি করছি, রথীন তখন আমায় বলল "চট্ করে একটু টিঞ্চার আয়োডিন দিতে পারিস অমল? এক্ষুনি আবার বাড়ী ফিরতে হবে, না হলে মার কাছে ধরা পড়ে যাব রে। জানিস ত, মা আবার ফুটবল খেলা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।"

ওর পাছার উপরের দিকটায় তখন অনেকটা কেটে গিয়ে একটু

একটু রক্ত পড়ছে। টিঞ্চার না পেয়ে, পানের দোকান থেকে চুন এনে দেখি রথীন বাড়ী চলে গেছে।

তিন দিন পর প্রথম পিরিয়ডে ছুটির ঘণ্টা পড়তেই আমরা ছুটলাম হেড মাষ্টার মশাইয়েই ঘড়ের দিকে। ওঁনার কাছ থেকে জানতে পারলাম ভোরবেলায় রথীন টিটেনাসে মারা গেছে।

রথীনের বাড়ীতে গিয়ে দেখি, সবাই বিমূঢ় হয়ে একটি প্রশ্নই করছে: ওর পাছার কাছে ওই রকম কখন কাটল আর কেমন করেই বা কাটল? আর কাটলই যদি ওটা ও শেষ পর্যন্ত গোপন করল কেন?"

সেদিন এ সব প্রশ্নের জবাব একমাত্র আমিই দিতে পারতাম, কিন্তু খুন না করেও, খুনীর ধিক্কৃত বিবেক নিয়ে সারাটা জীবন আমায় নীরব থাকতে হবে।

পেশোয়ার থেকে লাণ্ডি কোটালের ভেতর দিয়ে এ বাস জালালবাদ হয়ে কাবুল পৌঁছতে লাগবে পুরো দুটো দিন। বাসের বাইরে ভিতরে খালি ধুলো আর ধুলো। রোদে হুল্কা ওঠা, নিস্পত্র লালমাটির দিকে দুদণ্ড তাকানও অসম্ভব। এ পরিবেশে কারও পিছনে না লাগলে সময় কাটে কি করে!

কিট্টু, আপ্পারাওকে প্রশ্ন করল "আচ্ছা সিনিয়ার, ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক ট্রায়ালে তুমি বাতিল হয়ে গেছলে—সেই তুমি এই '৫৫ সালে বুড়ো বয়সে কাবুল সফরে ইণ্ডিয়া টীমের ক্যাপ্টেন হও কি করে?"

আপ্পারাও কোনো জবাব দিল না। শুধু স্মিত হেসে, একমনে 'চোটা' টানতে লাগল।

আমি ছিলাম ওর পাশের সীটেই। এ ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। আপ্পারাও-এর মত উঁচুদরের ইনসাইড বিশেষ করে ভারতীয় ফুটবলে, আমি আর দেখিনি। তাই বিষয়টা পরিষ্কার করে জানতে প্রশ্ন করলাম "মেডিকেল চেক্ আপে বাদ পড়েছিলে বুঝি?"

আপ্পারাও ঘাড় নেড়ে বলল "উঁহু।"

আমার কেমন যেন ঝোঁক চেপে গেল। এর বেশী আর ওকে প্রশ্ন করা ভদ্রতার বাইরে জেনেও জিজ্ঞাসা করলাম "তবে?"

শেষ হয়ে আসা চোটাটা বাইরে ছুড়ে এবার আপ্পারাও মুখ খুলল, "আমার কেসটা ভারি ইণ্টারেস্টিং। সেবারের ক্যাম্প শিলং-এ। অসুস্থতার জন্য ক্যাম্পে অ্যাটেণ্ড করতে আমার কয়েকদিন দেরী হয়ে গেছল। ইয়া মোটাসোটা, তাগড়াই এক মিলিটারী গুণ্ডার উপর ছিল ভারতীয় দলের পিটি করাবার ভার। ওসবে ত আমি মোটেই

অভ্যস্থ নই। প্রথমদিন ঘণ্টাখানেক পিটি করবার পর সমস্ত শরীর আমার যখন কাঁপছে তখন আমার দ্বিগুণ ওজনের সেই মিলিটারী পিটি ইন্‌স্ট্রাক্টর আমার কাঁধে চেপে অর্ডার দিল ওকে নিয়ে পুরো মাঠটা ঘুরতে।"

আপ্পারাও এখানে থামতেই বাসসুদ্ধ হৈ হৈ করে উঠল "তারপর"? আমাদের এ আলোচনা যে বাসসুদ্ধ সবাই উৎসুক হয়ে শুনছে তা আমরা খেয়াল করিনি। কাজেই আপ্পারাওকে মুখ খুলতে হল।

পাশের পকেট থেকে একটা নতুন চোটা বার করে তাতে আগুন লাগাতে লাগাতে স্বভাবসিদ্ধ হাসির ভঙ্গীতে আপ্পারাও বলল "আরে মাথায় নিয়ে মাঠময় ঘুরব কি, তাকে মাথায় তুলতে পারলে ত?"

"ট্যাক্সি এখনও পেলে না?"

আমি বললাম "কই আর পেলাম!"

ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে অফিসের ভেতর ঢুকলেন। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সেই সওদাগরী অফিসের বিরাট বাড়ীটার সামনে তখন অরণ্যের নির্জনতা।

আমার ফিল্ম শো শেষ হতে হতে রাত নটা হয়ে গেছে। সামনে মেসিনপত্র ছড়িয়ে, ঝাড়া আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি, তবু ট্যাক্সির দেখা নেই। ভদ্রলোক সিগারেট টানতে টানতে ফিরে এসে বললেন "ভয় নেই রামলগণকে ট্যাক্সি আনতে পাঠিয়েছি ও এক্ষুনি এসে পড়বে।"

"অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার তেমন তাড়া নেই। আসুন না একটু গল্প করি, অবশ্য আপনার যদি তাড়া না থাকে।"

ভদ্রলোক মুচ্‌কি হেসে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে লাগলেন।

আমি "আমার কৈশোরে ও যৌবনেও আপনি ছিলেন আমার হিরো। আপনার খেলার ষ্টাইল নকল করতে কি কম চেষ্টা করেছি! সেদিন আপনার খেলার কেউ নিন্দে করলে গায়ে ছুঁচের মত বিঁধত।"

ভদ্রলোক এবার হেসে বললেন "তাই বুঝি!"

"কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব আজ আপনাকে দিতে হবে।" উনি এবার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কি প্রশ্ন?"

"টপ্‌ ফর্মে খেলতে খেলতে, ধুম করে আপনি খেলাটা ছাড়লেন কেন? ক্লাবের সঙ্গে কোন গণ্ডগোল হয়েছিল?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন "অন্য ক্লাব গড়ের মাঠে ছিল না?"

আমি নিজের মূর্খতা স্বীকার করে নিয়ে বললাম "তা বটে।"

এরপর কিছুক্ষণ আপন মনে সিগারেট টানতে টানতে উনি যেন অতীতে হারিয়ে গেলেন। সামনে আমি যে দাঁড়িয়ে আছি হুঁশও নেই। সিগারেটেব শেষ অংশটুকু পা দিয়ে চাপতে চাপতে বললেন "আজ তোমাকে সে কথা বলতে বাধা নেই এবং তুমি বুঝবেও। খেলা ছেড়েছি সেদিন স্রেফ ভয়ে।"

অবাক হয়ে বললাম "আপনার মত ফরোয়ার্ড!"

বললেন "হ্যাঁ। খালি পায়ে ফুটবল যখন একটার পর একটা কাটাতাম কিংবা বিপক্ষের ডিফেন্সকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে, যখন আউটকে থ্রু বাড়াতাম, তখন একটা দর্শকও দেখিনি যে হায় হায় করে না উঠেছে। বক্স এরিয়ায় বল পেয়ে কোনদিন ঘাবড়ে যাইনি বা তাড়াহুড়ো করে বল নষ্ট করিনি। ৩০ গজ দূর থেকেও সুন্দর প্লেসিং করে কত গোলকীপাবকে বোকা বানিয়েছি। কিন্তু আমার এই সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রথম বাধা পড়ল বুট পড়ে খেলতে গিয়ে। তবু এও খানিকটা এড্‌জাস্ট করে এনেছিলাম, কেননা বৃষ্টির মাঠে বুট পড়ে খেলার অভ্যাস খানিকটা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় হার্ডলটা আর পার হতে পারলাম না।"

আমি প্রশ্ন করলাম "দ্বিতীয় হার্ডলটা কি?"

উনি ফ্যাকাসে হাসি হেসে বললেন "তোমাদের থার্ড ব্যাক, ফোর্থ ব্যাক সিষ্টেম। ছায়ার মত একটা হাফ ব্যাক আমার পিছনে পিছনে মাঠ ময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটাকে কোন উপায়ে এগিয়েছি ত আবার আর একটা। থ্রু বাড়াতে গিয়ে দেখি প্রত্যেকটা অফসাইড হয়ে যাচ্ছে। গোল এরিয়ায় ধীরে সুস্থে বল রিসিভ করবার ত প্রশ্নই ওঠে না। আর সেখানে ঢোকেই বা কার সাধ্য। ছয় জোড়া বুট ত পায়ের উপর লাফিয়ে পড়বার জন্য সব সময় রেডি। আর স্কোরিং? সেটা ত 'নীল' হয়ে গেল। আমি আবার একটু ধীর স্থির না হয়ে গোলে শট্ নিতে পারতাম না—তা আমাকে সে সময়টুকু এগেনষ্ট পার্টির ডিফেণ্ডাররা আর দিতে রাজী হল না। সে কি

দুশ্চিন্তা। চারদিকে রব উঠলো আমার নাকি 'ফর্ম' পড়ে গেছে। আমার মত স্লো ইনসাইডকে অত বড় নামী ক্লাবে আর খেলান উচিত নয়। আমি এদিকে অনেক চেষ্টা করেও কোন সুরাহা করতে পারলাম না। তখন ত আর এখনকার মত কোচ-টোচ ছিল না। তাই যা করতে হত —তা নিজে নিজেই। আবার মজা দেখে দু-একটা গোলও যদি সে সময়ে করতে পারতাম তাহলে খানিকটা খেলার নার্ভও ফিরে পেতাম কিন্তু তা আর হল না। ক্রমশঃ কুঁকড়ে যেতে লাগলাম। শেষে মাঠে নামতেও ভয় পেতাম। মনে মনে বুঝলাম খেলার দিন আমার ফুরিয়েছে। অবশেষে ঘুমের ঘোরেও যখন খেলার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘন ঘন আঁতকে চীৎকার করে উঠতে লাগলাম, তখন আমার স্ত্রী পরামর্শ দিলেন খেলা ছাড়তে। আমিও এ পরামর্শ মেনে নিয়ে মনে মনে বললাম সেই ভাল।" ভিতর থেকে কে যেন ভদ্রলোককে ডাক দিতেই উনি "আসছি" বলে চলে গেলেন। আমি চুপচাপ ফুটপাতের উপর ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। নির্জন অফিস পাড়ায় এবার যেন আমি অরণ্যের কান্না শুনতে পাচ্ছি।

সোনাদা তখন আমাদের বি. এন. আর রিক্রিয়শান ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী। তালগাছের মত লম্বা আর তেমনি সরু। সেই সোনাদা বললেন—

"অমল, আজ তুমি আমার পাশেই বস। তোমার লাক্‌টা আজ ট্রাই করা যাক।"

তখনও জানতাম লোকে চোখ খুলেই খেলা দেখে। সেই প্রথম দেখলাম, খেলা আরম্ভ হতেই সোনাদা চোখ বুজলেন। পাশ থেকে তাকে রিলে করে যেতে লাগল আমারই সহ-খেলোয়াড় সরল কুমার।

হঠাৎ একসময় সোনাদা প্রশ্ন করলেন—

"সরল কুমার চোখ খুলব ?"

সরল কুমার অভয় দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল "আজ্ঞে খুলুন। বি. এন. আর দারুণ চেপে ধরেছে।"

পরমুহূর্তেই বল যখন বি. এন. আর-এর গোল মাউথে, সোনাদা দেখি আবার চোখ বুঁজে ফেলেছেন। আর সরল কুমার একটানা রিলে করে চলেছে—

"বল এখন আমাদের ফুলব্যাক ক্লডিয়াসের পায়। ক্লডিয়াস বল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সামনে অপনেণ্টের হাফ ব্যাক। ক্লডিয়াস তাকে কাটাবার চেষ্টা করছে..."

সোনাদা চোখ বুঁজেই খিঁচিয়ে উঠলেন "সাহেবকে বল ক্লিয়ার করতে বল। বলকে যেখানে পারে মেরে দিতে বল। ব্যাক-এরিয়ায় ফুল ব্যাক আবার ডজ্‌ করবে কি! কেরদানি থামাতে বল। ওসব আমার টিমে চলবে না..."

সোনাদাকে অবিশ্রান্ত কথা বলার সঙ্গে চোখ বুজে হাত পা ছুঁড়তে দেখে, আমি সভয়ে সীট বদল করলাম।

জাতিস্মর দেখিনি বইতে পড়েছি। তবে ফুটবল শিক্ষকতার জীবনে কিছু কিছু ফুটবলারকে অন্য ফুটবলারদের চেয়ে অনেক সহজে এবং অতি দ্রুত শিখতে দেখেছি। আবার কিছু কিছু স্মরণীয় ফুট-বলারদের শেখবার বিচিত্র পদ্ধতিও উল্লেখযোগ্য।

লেসলি কম্পটন কোন রকম ছোটা, পিটি করা বা ট্রেনিং-এর ধার ধারতেন না। বিরাট খোলা মাঠে আপনমনে বলকে মাটিতে পড়তে না দিয়ে ছুটে বেড়ানই তার একমাত্র অনুশীলন ছিল।

ক্লান্ত হয়ে সবাই বসে পড়লে গোলকীপার কে· দত্তকে দেখেছি রাস্তা থেকে ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেদের ডেকে এনে গোলে শট্ মারতে বলতেন। ওদের ভেতর কেউ গোল করলেই, সঙ্গে সঙ্গে তার নগদ পুরস্কার মিলত কে. দত্তের কাছ থেকে খুচরা পয়সা। তাই অনুশীলনের আগেই তিনি বেশ কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে মাঠে ঢুকতেন।

ইংল্যাণ্ডের ফুটবল যাদুকর অ্যালেক্স জেমস তখন খ্যাতির—এভারেষ্টে। একদিন মোটরে স্বদেশ-স্কটল্যাণ্ডে ফিরছেন। এক অজ পাড়াগাঁয়ে ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখে মোটর থেকে নেমে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সে গাঁয়ের বড়রা তাকে চিনতে পেরে, বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল "আপনি অ্যালেক্স জেমস, এখানে এই অজ পাড়াগাঁয়ে, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বাচ্চাদের খেলা দেখছেন ?"

মৃদু হেসে, একটি খেলোয়াড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে অ্যালেক্স জেমস বললেন "ঐ ছেলেটি এক অদ্ভুত ড্রিবল করছে—যা আমি জানি না। অপেক্ষা করছি আরও নতুন কিছু যদি ওর কাছ থেকে শিখতে পারি।"

বাচ্চুদা মানেই ক্রিকেট, আর ক্রিকেট মানেই বাচ্চুদা।

সেবার আমরা জনা দশেক আসানসোল যাচ্ছি। প্যাসেনজার ট্রেন। ছোটখাটো সব স্টেশন ধরতে ধরতে গাড়ী কখন বর্ধমানে পৌঁছেছে, তা কারও খেয়াল নেই। বাচ্চুদার গল্প তখনও লারউড আর মহম্মদ নিসারের মাঝে ঝুলছে। এমন সময় ইয়া দশাশই ৫।৬ জন পাঞ্জাবী মিলিটারী আমাদের কামরায় উঠতেই বাচ্চুদার গল্প গেল থেমে, চোখ ঘুরতে লাগল ওদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

রমেন বরাবরই ঠোঁটকাটা। বাচ্চুদার এ অবস্থা দেখে বলে উঠল, "কি বাচ্চুদা, ফাষ্ট বোলারের চিহ্নগুলো মিলিয়ে নিচ্ছেন?"

বাচ্চুদা গম্ভীর হয়ে বললেন "মেলা ফ্যাচফ্যাচ্ করিস না। এইগুলো যদি মিলিটারীতে না ঢুকে ক্রিকেট নেটে আসত তাহলে হল, গীলক্রীষ্ট কোথায় উড়ে যেত।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন "হবে কি করে? আমাদের ক্রিকেট কর্মকর্তাদের কি সেদিকে নজর আছে?"

বিমান এতক্ষণ একটি কোণে চুপটি করে বসে কি একটা বিলিতি জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিল। মফঃস্বলের এক খুদে কলেজে সবে লজিক পড়াবার একটা চাকরী পেয়ে গম্ভীর হবার সাধনা করছে। বাচ্চুদার কথার প্রতিবাদে বলে উঠল কিন্তু সেদিন একটা ঘটনা দেখে কেমন খটকা লাগল।"

বিমানের কথায় মনে হল বাচ্চুদা মনে মনে চটেছেন। তবু রাগ প্রকাশ না করে খানিকটা বিদ্রূপের সুরে বললেন "চট্‌পট্ বলে ফেলো মানিক·আর দেরী কোর না।"

বিমান "সেদিন সকালবেলা সবে দাঁতে ব্রাশটা ঠেকিয়েছি—

পাড়ার আখড়ার একদল কুস্তিগীর আমাদের বাড়িতে হাজির। তাদের অভিযোগ যে একজন বাঙালী ছেলে, তাদের মারধর করেছে, কাজেই আমাদের সব ভাইকে ওখানে গিয়ে এর প্রতিকার করতে হবে। পাড়ার যত ঝামেলা, বড়দাই সালেসী করে। তাই বড়দাকেই এগিয়ে দিলাম। বড়দা খানিকটা ইতস্ততঃ করে তার জগাখিচুড়ী হিন্দীতে বললেন "তুম লোক এত্না বড়া সব পালোয়ান হ্যায় আউর তুম লোক্‌কো একঠো লেড়কা কেইসে মারনে শিক্‌তা ?"

তা কে কার কথা শোনে! সব পালোয়ান মিলে হিন্দীতে এমন হৈ চৈ জুড়ে দিল যে আমাদের সবাইকেই যেতে হল। আর অকুস্থলে গিয়েই আমাদের সবায়ের চক্ষু স্থির। একটা ১৯।২০ বছরের ডিঙ-ডিঙে, রোগা-পটকা ছেলে কাপড়টা মালকোঁচা করে পরা, খালি গা, তাল ঠুকছে আর চেঁচাচ্ছে— আও কোন কোন লড়েগা চলা আও।' কাছেই একটা দশাশই লাশ, উপুর হয়ে বসে দুহাত দিয়ে নাক টিপে-কাতরাচ্ছে।

বড়দা ছেলেটিকে এককোণে ডেকে নিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ভয় করল না এতগুলো ষণ্ডামার্কা কুস্তিগীবদের সঙ্গে একলা লড়ে যেতে ?"

ছেলেটি অবজ্ঞাব স.ঙ্গ বলল "ভয় করবে কেন মশাই ? এগুলোর শুধু কুমড়োর মত চেহারাটাই আছে; মারামারি করবার মত কি হিম্মত আছে, না সাহস আছে ? ঐ যে ব্যাটা নাকটিপে উপুড় হয়ে বসে আছে ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না তলপেটে এক লাথি খেয়েই কেমন কুপোকাৎ আর বাছাধনের উঠে বসবার ক্ষমতা নেই।"

আমাদের সব ভাইদের নিয়ে বড়দাকে ফিরতে উদ্যত দেখে কুস্তিগীরের দল আবার অনুনয় বিনয় সুরু করল। বড়দা কিন্তু এবার কারও কথায় কর্ণপাত না করে চলে আসতে আসতে গম্ভীর হয়ে বললেন "তুমলোক কুস্তি ছোড়কে আভি বক্সিং শিখনে সুরু করো।"

প্রতিশোধ !

কখন থেকে দমদমের হ্যাঙ্গারে বসে, ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস করছি ; তবু প্লেনের দেখা নেই। এ ট্যুরের ম্যানেজার হাবলদা। অতীতের প্রথিতযশা দিকপাল ফুটবলার। অর্থাৎ আমাদের লাইনের লোক। তাই খেলার গল্প জুড়ে দিতেই সকলের উসখুস্থুনী বন্ধ হল।

হাবলাদার প্রথমদিকের সূক্ষ্যরসের গল্পগুলো তেমন জমল না। কিন্তু বলাইদার ঘুঁষিয়ে সাহেব মারা, বাঘাদার কাঁচি মেরে যে কোন ওস্তাদ ফুটবলারকে মাটিতে পেড়ে ফেলা এবং গোলকীপার সন্তোষ দত্তর বিপক্ষের সেনটার ফরোয়ার্ডকে ঘুঁষিয়ে নাক ভেঙে দেওয়ার গল্প সুরু হতেই সকলে নড়েচড়ে বসল। আর তুলসীদার গল্পতো আসর রমরমিয়ে তুলল। উইলসের একটা আনকোরা প্যাকেট থেকে সিগারেট বাড় করে তাকে ধরাতে ধরাতে হাবলাদা বললেন "তুলসীদা আসলে বাঙলার বাইরের লোক। খেলার আগে আচ্ছা করে ল্যাঙট কষে পাঁচ শো ডন আর হাজারখানেক বৈঠক দিয়ে নিতেন তুলসীদা। এর পরই তিনি পান করতেন ভঁইসের বাঁট থেকে দোওয়ানো পাঁচপো খাঁটি দুধ।"

কে যেন অবাক হয়ে বলল "খেলার আগে এত কসরৎ তার ওপর আবার অতটা কাঁচা দুধ ?"

হাবলাদা বললেন "ওটা ত তুলসীদার কাছে নস্যি। সেবার ডুরাণ্ডে ম্যাণ্ডিমোনিয়ামের সঙ্গে খেলা। ডুরাণ্ড তখন খেলা হত সিমলায়। ম্যাণ্ডিমোনিয়ামের এক ইয়া তাগড়া নিগ্রো আমাদের চাইনীজ ওয়াল, গোষ্ঠবাবুর হাত ভেঙে দিল। ইন্দ্রপতনে সে ম্যাচে আমরা হেরে গেলাম। ঠিক এর পরেই এরিয়ান্সের হয়ে খেলতে গেছি-লক্ষ্ণৌতে আর পড়বি ত পড় খেলা পড়ল ঐ ম্যাণ্ডিমোনিয়ামের

সঙ্গেই। তুলসীদা তখন এরিয়ান্সের সেন্টার-হাফ। প্রথম থেকেই খেলা বেশ জমেছে। হঠাৎ দেখি মাঠের অন্যদিকে স্যাণ্ডিমোনিয়ামের সেই কালো নিগ্রোটা আর আমাদের তুলসীদা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কালা সাহেব দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ইংরাজীতে কি যেন বিড়বিড় করছে আর আমাদের তুলসীদা নিজের থায়েতে তাল ঠুকতে ঠুকতে হুঙ্কার ছাড়ছে 'আয় শালা আয়, হিম্মত থাকে ত লড়ে যা। তুই শালা আমাদের গোষ্ঠবাবুর হাত ভেঙেছিস আজ আর তোর রক্ষা নেই।' ওদের দুজনকে ছাড়িয়ে দেবার আগেই, হঠাৎ দেখি— তুলসীদা গোঁত্তা মেরে নিগ্রোটার পেটের ভেতর ঢুকে গেল। আর তারপরেই নিগ্রো সাহেব মাটিতে চিত। নড়েও না চড়েও না। একেবারে সেন্সলেস্। নিমেষে ফুটবল মাঠটা কুস্তির আখড়ায় পরিণত হতে দেখে আমরা কোনছার, গোরা-সাহেব রেফারীও হতভম্ব। হাতের বাঁশি তার আর মুখে ওঠেনি, হাতেই ধরা রয়েছে।"

ভদ্রলোক তখন কলকাতার এক নামকরা ফুটবল-ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারী। উচ্চ-শিক্ষিত ও অতীতের প্রখ্যাত ফুটবলার বলে তার উপর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু খেলোয়াড় বন্ধুবান্ধবরা এই নিয়ে ঠাট্টা করে বলত "শত হস্ত দূর থেকেই ঐ শ্রদ্ধা ট্রদ্ধাগুলো কোরো বাবা, কাছে ভিড়তে দিও না। ভিড়তে দিলেই দেখবে স্রেফ ভাঁওতা দিয়েই তোমায় ওনার ক্লাবে সইটি করিয়ে নিয়েছে।"

আমি এ ব্যাপারে কিছুটা বিশ্বাস করতাম, কিছুটা ভাবতাম অতিশয়োক্তি।

সেবাব আমাব এক উঠতি-ফুটবলার বন্ধুব বাড়ীতে বসে গল্প কবছি হঠাৎ ভদ্রলোক তার গাড়ী নিয়ে সেখানে হাজির। উদ্দেশ্য অবশ্য-বন্ধুকে ওনার ক্লাবে সই করানো। কিন্তু বন্ধুটির এ ব্যাপারে পুবোপুরি অনিচ্ছা। কিন্তু মুখেব ওপর ভদ্রলোককে না বলতে না পেবে বন্ধু তার দুই বড়দাদাদেরকে তালিম দিয়ে উপরতলা থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এল।

ভদ্রলোক ধানাই পানাই না করে, টানা ভ্রূ জোড়া দাদাদের মুখের উপর তুলে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনাদের ভাইকে আমার ক্লাবের জন্য নিতে এসেছি এতে আপত্তি কেন করছেন, তা ঠিক ধরতে পারছি না। টাকাপযসা যা এখন ও ওর ক্লাব থেকে পায় তার ডাব্‌লেবও বেশী আমার কাছ থেকে পাবে। আমার কথায় যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয় আজই ওকে আমার ক্লাবে সই করতে বলুন অর্ধেক এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।"

দাদারা যে রোখ নিয়ে, উপর থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন,

ভদ্রলোকের কথা শুনে—তার প্রায় সবটাই কোথায় উড়ে গেল। এক দাদা হাত কচলাতে কচলাতে বললেন "আরে তা নয়, তা নয়। আসল ব্যাপারটা কি জানেন ও ত এই বছর তিনেকমাত্র গড়েরমাঠে খেলছে, তার উপর খেলে ইনসাইডের পজিসনে—ওর কি এখনই সে ধরনের ম্যাচিওরিটি অথবা নার্ভ তৈরী হয়েছে যে আপনাদের অতবড় টিমে গিয়ে সাকসেসফুল হতে পারবে।"

ভদ্রলোক এবার মুচ্‌কি হেসে উত্তর দিলেন "জলে না নেমে, শুনেছেন কি কেউ কোনদিন সাঁতার শিখেছে ? নার্ভ বা ম্যাচিওরিটির ব্যাপারটিও ঠিক তেমনি। ভার মাথায় চাপিয়ে দেখুন সে বইতে পারে কিনা। তারপর অন্যকথা। সুযোগটুকু না দিলে প্রমাণ হবে কি করে যে তার নার্ভ আছে কি নেই। আর অভিজ্ঞতাই তো ম্যাচিওরিটি নিয়ে আসে।"

দাদারা এতক্ষণ যদিও বা একটু আধটু আপত্তি জানাবার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রলোকের কথা ও যুক্তির ধারে সেটুকুনও থেমে গেছে। ভদ্রলোক পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা ভাল করে পুঁছে নিয়ে আবার বলতে সুরু করলেন "আসল কথা কি জানেন আমরা যখন ইনসাইড রিক্রুট করি তখন প্রথমেই দেখি যে সে ছেলেটি বল-প্লেয়ার কি না। অর্থাৎ বলের ওপর তার ফুল-কণ্ট্রোল আছে কি না। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখি তার বল ডিস্ট্রিবিউশন করার ক্ষমতা, দম, স্পীড, দুপায়ের টেরিফিক কিক, আছে কি না—আর এর সঙ্গে হেডিং থাকলে ত আর কথাই নেই।"

ভদ্রলোককে এইখানেই থামিয়ে দিয়ে এক দাদা ব্যঙ্গের সুরে বললেন "আর কি কি গুণ খুঁজতে বাকী রাখলেন মশাই ? এ যে সেই বাঙালী ঘরের ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্তার ছেলের পাত্রী খোঁজাকেও হার মানিয়ে ছাড়লেন।"

ভদ্রলোক কিন্তু দাদার এ কথায় মোটেই চটলেন না। বরঞ্চ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন "আপনার কথা একশোর উপরও

এক পার্সেণ্ট সত্যি। আপনারা জীবনে কোনদিন ফুটবল খেলেছেন কি না জানি না তবে বিশ্বাস করুন একজন সার্থক ইনসাইড মানেই একজন কম্প্লীট ফুটবলার। সবচেয়ে মজার কথা কি জানেন এত ত শক্ত ইনসাইড্ খেলা কিন্তু এত আরামও আপনি অন্য কোন পজিশনে খেলে পাবেন না। এই আমার কথাই ধরুন না কেন। আমি বাঙলা দেশের ছেলে নই। বাঙলার বাইরেই আমার জন্ম, শিক্ষা এবং খেলাধুলোয় হাতেখড়ি। আমি বরাবর ইনসাইডেই খেলতাম। কতবার কলকাতার বিভিন্ন ক্লাব থেকে ডাক এসেছে, তা আমার কলকাতায় আসাই হয়নি। বাড়ীর ছিল প্রচণ্ড আপত্তি। শেষে এম, এ পড়তে এসে কলকাতায় খেলবার সুযোগ পেলাম। কিন্তু টাইম তখন 'আউট অব জয়েণ্ট'। বড় ক্লাবে ইনসাইড খেলা চারটিখানি কথা নয়। এ দিকে অপেক্ষা করবার মত বয়স বা ধৈর্য্য কোনটাই নেই। একদিন উইং হাফ না আসাতে আমাকেই ঐ পজিশনে নামিয়ে দেওয়া হল। ব্যাস কেল্লা ফতে। এমন খেলা খেললাম সেদিন যে আমায় বসাবার প্রশ্নই আর ওঠে না। কিন্তু হলে হবে কি এরপর কত খেলাইত উইং হাফ হিসেবে খেললাম কিন্তু প্রত্যেকবার সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করতাম যে, কেউ যদি একবার আমায় ইনসাইডে খেলতে বলে !"

এবার বন্ধুটি বলল "আপনি ক্লাব কর্তৃপক্ষকে কেন বললেন না যে আপনি ইনসাইডে খেলতে ইচ্ছা করেন।"

ভদ্রলোক করুন স্বরে বললেন "তা কি আর বলিনি। কিন্তু তাঁরা এক কথায় আমায় নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, ইনসাইড খেলবার মত শারীরিক ক্ষিপ্রতা এবং গতিবেগ আমার শরীরে নেই। তার ওপর বাঁ পা ভাল চলে না। কয়েক বছর আগে যদি আমি ঐ ক্লাবে আসতাম !"

শিকার শিকার খেলার ভাবটা কেটে গিয়ে তখন ঘরে নীরবতা। খালি মাথার ওপর বিলিতি পাখাটা একটানা কট্ কট্ আওয়াজ করে

চলেছে। ভদ্রলোক বাইরের দিকে চেয়ে আপনমনে বলে চললেন "সায়গল তখন ফৈয়াজখান সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধেছে। প্রতিবেশী এবং সায়গল-ফ্যান বলে তখন প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই ঢুঁ মারতাম সায়গলের বাড়ী। সেদিন ওখানে যেতে একটু বেশী রাত্তিরই হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি, সায়গল তাঁর কোল থেকে হারমনিয়মটা নামিয়ে ওস্তাদের সামনে রেখে কিছু গাইতে অনুরোধ করছেন আর ওস্তাদ তার ডাগর, বিষণ্ণ চোখ দুটো পশ্চিমের জানালা দিয়ে বাইরে মেলে দিয়ে কি যেন ভাবছেন।

সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে—বেশ গুটিকয় স্কচ হুইস্কির আর সোডার খালি বোতল। কিছুক্ষণ ভাঙা ভাঙা তাঁর সেই বেস্ ভয়েসের গলায় ওস্তাদ বললেন "বেটা, তুমি আর আমাকে গাইতে অনুরোধ কোর না। শরীরটা যখন আরবী ঘোড়ার মত তেজী ছিল—তখন কিন্তু আমি গান কাকে বলে জানতাম না, শুধু তান, বাট আর সরগমের তরিকত দেখিয়ে মাইফেলের পর মাইফেলে আগুন ধরিয়ে দিতাম। কিন্তু ভাগ্যের কি ফের দেখ আজ যখন বুঝতে পারি গান কাকে বলে, মাঝরাতে দরবারী যখন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে তখন তাকে রূপ দিতে গিয়ে দেখি—আমার গলা দিয়ে ভাঙা কাঁসির আওয়াজ বেরুচ্ছে।"

রবিদা আমাদের গলির মোড়ের চায়ের দোকানটার মধ্যমণি হলেও, যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি সব বিষয়েই সমানতালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু খেলাধুলোর কোন প্রসঙ্গ আমি তুললেই, কেন জানি না আমায় থামিয়ে দিয়ে বলবেন "তুই আর মেলা ফ্যাচ্ফ্যাচ্ করিস না। ভারী আমার স্পোর্টসম্যান এলো রে!"

আমি হয়ত রবিদার এ উক্তিতে প্রতিবাদ করি, "কেন রবিদা, আমি আবার কি করলাম? আর তাছাড়া যতদূর জানি, সারা জীবনে আপনি কোনদিনই খেলাধুলো করেননি, কাজেই আপনার পক্ষে কি এ ধরণের রূঢ় সমালোচনা করা ঠিক হচ্ছে?"

চারমিনারের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে, দোকানের পাথরের টেবিলটার উপর ঠুকতে ঠুকতে রবিদা শান্ত মেজাজে বলেন "তাতে কি প্রমাণ হোল? আমি জীবনে সেতার ধরিনি বলে রবিশঙ্কর আর বিলায়েতের তফাৎটা ধরতে পারব না? আমার কোন লেখাই আজ পর্যন্ত হাতে লেখা ম্যাগাজিনেও বেরোয়নি বলে আমি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখার সঙ্গে আজকের পূজা সংখ্যার ট্রাশ উপন্যাসগুলোর তুলনা করব না? আসলে ব্যাপারটা কি জানিস—ইনটারেষ্ট। ঐটাই আসল। তোদের মতন স্পোর্টসম্যানরাই আজ আমাদের মতন দর্শকদের খেলাধুলোর ইনটারেষ্টটা নষ্ট করে দিয়েছিস। আজ পর্যন্ত অলিম্পিকের কোন ইভেণ্টস বা কোন্ গেমে তোরা পাত্তা পেয়েছিস বল? এতদিন তবু হকিটা ছিল; তাও শেষ করে দিয়ে তোরা হাত ধুয়ে বসে আছিস।"

এত সহজে রবিদার যুক্তিগুলো মেনে নিলে স্রেফ ওর কাছে

হার স্বীকার করতে হয়, তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য বলি "অলিম্পিকের কোন গেমেসে কোন দেশ এক নাগাড়ে চ্যাম্পিয়ান হয়ে চলেছে সেটা আপনি দেখান। অনেকদিন আমরা হকিতে চ্যাম্পিয়ান ছিলাম এখন কিছুদিন হয়ত আমরা নীচে নেমে আসব। তারপর আবার আমরা উপরে উঠব এইটাই নিয়ম।"

রবিদাকে অত সহজে হারমানানো সম্ভব নয়। প্রতিবাদে বললেন "তা কেন? হাণ্ড্রেড মিটারে দেখ—আমেরিকা বরাবর ফার্স্ট হয়ে চলেছে। তাকে কেউ আজ পর্যন্ত হারাতে পেরেছে? তোদের ফুটবলেও দেখ। ১৯৫৮ ও ১৯৫৭ দু'বার পর পর ওয়ার্ল্ড কাপ নেবার পর ব্রাজিল শুধু ১৯৫৭-এ হারিয়েছে। আবার ১৯৫৭-এর ওয়ার্ল্ড কাপটা ঠিক ম্যানেজ করে নিয়েছে। হতাশা ওদের কি পেছিয়ে দিয়েছে? আসলে আমাদের মত হতাশ হবার জাতই ওরা নয়।"

আমি হেসে বললাম "আজকের ফুটবল—দুনিয়ায় ব্রাজিলের অপ্রতিরোধও রূপটা দেখে কেউ যদি মনে করে যে তাকেও অনেকগুলো বছর হতাশা আর পরাজয়ের গ্লানি মাড়িয়ে উপর দিকে উঠে আসতে হয়নি তাহলে সে বিরাট ভুল করবে।"

রবিদা আমার কথা শুনে, খানিকটা আমতা আমতা করে বললেন, "তাই নাকি। আমার ও বিষয়ে তেমন পড়াশোনা নেই। তুই বল তো খানিকটা শুনি।"

আমি বলি: "ব্রাজিলে ফুটবল খেলা সুরু হয় গত শতাব্দীর শেষের দিকে। চার্লি মিলার বলে একজন ব্রিটিশ এই খেলা ওদেশে প্রথম চালু করেন। ১৮৮৮ সালে ব্রাজিলে যখন দাস প্রথা উঠে গেল তখন ওদেশের ক্রীতদাস, নিগ্রো আর মুলোট্রোরা নিজেদের প্রকাশ করবার একটা মাধ্যম খুঁজে পেল যার নাম ফুটবল। অনেকটা ঠিক আমেরিকায় আজকের বক্সিং, রিং-এ নিগ্রোদের আত্মপ্রকাশের মত।

আমাদের দেশে ১৯১১ সালে সাদা গোরাদের হারিয়ে আই. এফ. এ শীল্ড জিতে আমরা তখন আত্মতুষ্ট। ব্রাজিল আমাদের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ফুটবল খেলা সুরু করে—ফুটবলে বিশ্ববিজয়ী হবার স্বপ্ন দেখছে তখন থেকেই। কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড কাপে অংশগ্রহণ করেও তারা কিছুতেই আর সাফল্য লাভ করতে পারছিল না। ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে তারা ভেবেছিল এবার বুঝি তাদের স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু তাদের সমস্ত আশাকে নস্যাৎ করে দিয়ে উরুগুয়ে যখন ব্রাজিলকে ২-১ গোলে হারিয়ে ট্রফিটা ঘরে নিয়ে গেল, সেই দিন ব্রাজিলের মারকানা স্টেডিয়ামের দুই লক্ষ দর্শকও স্টেডিয়ামের পথ মাড়ান বন্ধ করে দিল।

ব্রাজিল ফুটবল সংস্থা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল যে ফুটবলকে নিজের দেশে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে—নতুন কিছু করে বিশ্বজয়ী হতেই হবে। তাই সুইজারল্যাণ্ডে বিশ্বকাপের খেলায় ব্রাজিল যে বর্বরোচিত ব্যবহার করেছিল তার ইতিহাসও বোধহয় কোনদিন মুছে যাবে না। সে দিনটা ছিল ১৯৫৪ সালের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝর ঝর এক বিকেল। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ব্রাজিলের খেলা। এই খেলার রিপোর্টে প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক র‍্যালফ্ ফিন লিখেছেন—

আমার জীবনে যত ম্যাচ দেখেছি তার ভিতর এইটিই বোধকরি সবচেয়ে বিস্ময়কর। দর্শকদের চোখের সামনেই যখন কিল, চড়, ঘুঁষি, কনুই এবং লাথি উভয়পক্ষের খেলোয়াড়দের ভিতর অবলীলাক্রমে বিনিময় চলছিল—সেই সময় আমার ত বারবার মনে হচ্ছিল, এ খেলা বুঝি অনন্তকাল চলবে। অবশ্য এইসব ক্রোধান্দীপ্ত কাজগুলি দলগত ভাবে সুরু করে ব্রাজিল।

সময় সময় যে ভাল খেলা হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু এ সব কিছুই হারিয়ে গিয়েছিল ক্রোধোমত্ত খেলোয়াড়দের ভেতর এবং তারাই এ খেলাটিকে এক দীর্ঘ রক্তাক্ত যুদ্ধে পরিণত করেছিল।

আসলে এ হল সেই ম্যাচ যা লোকের ভুলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু এই পর্যন্ত ব্রাজিল যা করেছিল, তাতেও তাকে ক্ষমা করা চলে কিন্তু খেলার পর তারা যা করেছে, তাতে তাকে শাস্তির হাত থেকে কিছুতেই অব্যাহত দেওয়া চলে না। কেননা তারা যদি মাঠে এবং মাঠের বাইরে এ ধরণের ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে এক্ষুনি তাকে পৃথিবীর সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক খেলা থেকে বার করে দেওয়া উচিত।"

রবিদা আমাকে চুপ করতে দেখে ঔৎসুক্যের স্বরে প্রশ্ন করলেন "কেন, কি করেছিল ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড়রা খেলার পর?"

আমি বলি: "খেলার পর হাঙ্গেরীয়ান খেলোয়াড়রা যখন তাদের ড্রেসিংরুমে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড়ই সেই ড্রেসিংরুমের তালা ভেঙে, সেই ঘরে ঢুকে পড়ে এবং বাল্ব ভেঙে অন্ধকারের সুযোগে হাঙ্গেরীয়ান খেলোয়াড়দের কিল, চড়, ঘুঁষি এবং বুটের ষ্টাড দিয়ে মারধর করে। সেদিন ঐ মারধরের চোটে দুচারজন হাঙ্গেরীয়ান খেলোয়াড় হয়ত মারাই পড়ত যদি না ঠিক সময়ে পুলিস এসে পড়ত।"

রবিদা এবার আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলেন "খেলাতে ত হারজিত আছেই তবে ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের এ ধরণের আনস্পোর্টিং ব্যবহারের কারণ কি?"

আমি উত্তর দিই: "স্বপ্ন দেখার ও সেই স্বপ্ন সফল না হওয়ার বিকৃত পরিণতি। অথচ ব্যক্তিগত ক্রীড়াশৈলীর দিক থেকে তুলনা করলে সেদিন ব্রাজিলের দুতিনজন খেলোয়াড় ছিল অতুলনীয়। বিশেষ করে রাইট আউট জুলিনহোর একটি গোল করা দেখে ফিন্ লিখেছেন—'এ সেই ধরণের গোল যা প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রই স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে যে সে একদিন ভবিষ্যতে ঐ রকমের একটা গোল করবে। এ সেই ধরণের গোল যা প্রত্যেক ফুটবলার গর্বের সঙ্গে স্মরণ করবে। এ সেই ধরণের গোল যা দেখে দর্শকরা উত্তেজনা আর

হাততালিতে ফেটে পড়বে এবং একটি পুরো টিমকেই এ পুনরুজ্জীবিত করবে। এ সেই ধরণের গোল যা হাজার মাইল পার হয়ে এসে দেখবারই যোগ্য।'

আলোচনাটা সুরু হয়েছিল হিন্দুধর্ম নিয়ে। লক্ষ্য করেছি, বরেনদা এলেই আলোচনাটা ধর্মের দিকে ঘুরে যায়। আর এই তর্ক করতে গিয়েই বরেনদার এতদিনকার স্থির বিশ্বাস যে এমনভাবে ফাটল ধরবে আড্ডার তাই কি কেউ আশা করেছিলাম? আমরা বরঞ্চ গোড়াতে সলিলকে থামাতেই চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সলিল তখন খুব গরম খেয়ে গেছে। আমাদেরকেই বরং উল্টো ধমক দিয়ে বলেছে—"থামুন ত আপনারা। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, বরেনদা খালি হিন্দুধর্ম, বেদ-বেদান্ত করছে। যত সত্য সবই নাকি মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন, নতুন আর কিছু বলবার নেই। এই সব আজকের দিনে কোন শিক্ষিত ছেলে মানতে পারে? আর আমি মেডিকেল ষ্টুডেন্ট আমাকেই বলছেন 'বেদে না উপনিষদে নাকি লেখা আছে—মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং মানুষ যা কিছু শেখে বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তা এই মাত্র পাঁচটি ইন্দ্রিয় বোধ দিয়েই।"

বরেনদা যেন এই সুযোগটুকুর জন্যই এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। গলা চড়িয়ে বললেন "তোমাদের বৈজ্ঞানিকরা এই সত্যকে অস্বীকার কবতে পারে?"

সলিল ততক্ষণে কেমন যেন শান্ত হয়ে গেছে। মৃদু হেসে বলল "চোখ, কান, নাক, জিভ এবং ত্বক এই পাঁচটি সংবেদনকে আজকের বৈজ্ঞানিকরা অস্বীকার করছেন না। তবে বলছেন যে এ ছাড়াও মানুষের আরও অনেকগুলি সংবেদন আছে—যা আগেকার মানুষের জানা ছিল না।"

এর পর সলিল আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন "আপনি ত খেলা-ধুলো করেন। 'কাইনেসথেটিক সেনসেশন' কাকে বলে জানেন?"

আমাকে ঘাড় নাড়তে দেখে বলল "পেশী সঞ্চালন থেকে উদ্ভূত যে

অনুভূতি তাকেই বলা হয় কাইনেস্থেটিক সেনসেশন। অ্যাথলেট, সাঁতারু, জিমন্যাষ্ট, ফুটবলার প্রভৃতি খেলোয়াড়েরা যে নিজেদের খেলার কৌশল বা 'স্কিল' শেখে তা এই বিশেষ অনুভূতি থেকেই। খেলায় যত সে নিপুণ হবে—সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও তার তত সূক্ষ্ম ও তীব্র হবে।"

বরেনদার মুখটা ততক্ষণে ছোট হয়ে গেছে। উনি আড্ডা থেকে পালানর জন্য উসখুস করছেন। আলোচনার মোড় ঘোরাতে তাই আমাকেই এগিয়ে আসতে হল।

"একই সাবজেকটর সঙ্গে লেগে থেকে থেকে, জিনিয়াসদের এই সেনসেশনগুলো এমন অসাধারণ তীব্র হয় যে সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলো গল্পের মতই মনে হয়। বেশ মনে পড়ে—তখন রাতদিন ক্লাসিক্যাল গানের জলসা চষে বেড়াচ্ছি। গ্রীষ্মের ঠা ঠা রোদে সেদিন বাড়ী ফিরছি। সঙ্গে ছিলেন আমার তবলার ওস্তাদ স্বর্গীয় রাধাশ্যাম দত্ত। নিমতলার মোড়ে দেখা হয়ে গেল—এক ওস্তাদ গাইয়ের সঙ্গে। দাড়ি-গোঁপ নিয়ে ইয়া দশাশই চেহারা। নমস্কার। প্রতিনমস্কার। হাত পাকড়া-পাকড়ি। তাল এবং বাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা এবং বৈচিত্রের আলোচনাব পর শুরু হল উভয়ের নোটেশনের শক্তি পরীক্ষা। বড় রাস্তার উপর দিয়ে একটা পাবলিক বাস-ভেঁপু বাজিয়ে চলে যেতেই, গাইয়ে ওস্তাদ প্রশ্ন করলেন "কোথায় আছে?" আমার ওস্তাদ অমনি গুনগুনিয়ে উদারায় গলা মেলাতে সুরু করে দিলেন। এর পর তিনি হঠাৎ ইলেক্ট্রিকের পোষ্টে দম করে একঘুঁষি মেরে বললেন "বল তো এটা কোথায় আছে?"

ওস্তাদ গাইয়ে ভদ্রলোক রাস্তার উপরেই চড়ার পর্দাগুলো সেধে নিয়ে বললেন "তারার কোমল ধৈবত।"

এইভাবে কিছুক্ষণ শ্রবণশক্তি পরীক্ষার পর দুজনেই দেখি মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নতুন কোন ধ্বনীর অপেক্ষায়। আমি খালি হতভম্ব হয়ে দুজনের কানের দিকে তাকাতে লাগলাম।

আমার এক সাহিত্য-পাগল বৌদি (লুকিয়ে লুকিয়ে বোধহয় গল্প, কবিতাও লিখতেন) প্রায়ই আমাকে অনুরোধ করতেন—ঠাকুরপো, আপনাদের খেলোয়াড় জীবনের একটা গল্প বলুন না।

বারবার তার এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে, আমিই তাকে পাল্টা প্রশ্ন করতাম—সকাল-সন্ধ্যে, স্রেফ চামড়ার বলে লাথানোই যার জীবন তার জীবনে গল্প কোথা থেকে আসবে বৌদি ?

আমার এ যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে উনি বলতেন—আহা আপনাদের জীবনে কম বৈচিত্র নাকি ? খেলার দৌলতে সারা পৃথিবী চষে বেরিয়েছেন, সেইসঙ্গে কত চরিত্রই না দেখেছেন। কত অনুরাগী অনুরাগিনীর দল আপনাদের ঘিরে থাকে, আপনাদের জীবনে কম রোমান্স নাকি ?”

আমি সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কেটেছি—সেই সঙ্গে আমাদের চোদ্দ পুরুষ তুলে গালি-গালাজটাও দয়া করে যোগ করবেন।

উনি হেসে বলেছেন—এই মাথায় তুলে নাচা পরমুহূর্তেই আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা—এই প্রচণ্ড কনট্রাস্ট এর মাঝে আপনাদের মানসিক প্রতিফলনটাই ত সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে।

আমি সুবিধা পেয়ে প্রশ্ন করি—তাহলে বাংলা সাহিত্যে আমাদের নিয়ে একটা সার্থক ছোট গল্প পর্যন্ত লেখা হল না কেন ?

বৌদি বললেন, তারজন্য বাংলা সাহিত্যিকদের গণ্ডীবদ্ধ জীবনচর্চাই দায়ী। তবে আগামী দিনে যে লেখা হবে না তাই বা কে বলতে পারে?

সপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘ফুটবল খেলতে হলে’ তখন নিয়মিত বেরুচ্ছে।

একদিন বৌদির বাড়ী যেতেই, উনি চেপে ধরলেন—ঠাকুরপো এবার ত লিখতে পারেন? আপনার লেখা পড়ে মনে হয় আপনি চেষ্টা করলেই পারবেন।

এবারও নিজের অক্ষমতা ঢাকতে জবাব দিই—বিভিন্ন স্পোর্টস, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকাতে ত আজকাল প্রচুর খেলোয়াড়াদের জীবনী বের হচ্ছে।

বৌদি হেসে বলেছেন—ও ত সাংবাদিকতা। সাহিত্য নয়।

আমার সেই বৌদি আজ বিদেশবাসিনী। জানিনা বাংলা সাহিত্যে তার সেই অকৃত্রিম অনুরাগ আজও বর্তমান কি না। তবে এই গল্প 'অন্য কোন ওষুধের জন্য' যদি তার হাতে পড়ে, তাহলে মুচকি হেসে তিনি ঠিক প্রশ্ন করবেন—কি ঠাকুরপো, কি বলেছিলাম?

আমিই শুধু সলজ্জ ভঙ্গীতে তাকে প্রশ্ন করতে পারব না।

—সত্যি করে বলুন ত বৌদি, এটা সাংবাদিকতার গণ্ডী পেরিয়ে সাহিত্যের চৌকাট ছুঁয়েছে?

ভেবেছিলাম পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে কাকেও জিজ্ঞাসা করলেই চলবে, কিন্তু ওখানে পৌঁছে তেমন জুৎসই কাকেও খুঁজে পেলাম না। অথচ রাত মাত্র ন'টা। এদিক ওদিকের ফুটপাত দিয়ে ছ'একজন যারা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের এতই ত্রস্ত গতি যে তাদের থামিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা লাগছে। গাড়িগুলোও হেড লাইটের আলো ফেলে, একটার পর একটা হুশ্ হুশ্ করে বেবিয়ে যাচ্ছে। একটু আগের একপশলা বৃষ্টির দরুন রাস্তাটা ভিজে; আর তারই উপর আলো পড়াতে চওড়া পিচের রাস্তাটা হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

পূবদিকে কিছুদূর এগোতেই, ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে ঢ্যাঙা একটা লোককে বিড়ি টানতে টানতে আমার দিকেই আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমায় কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই লোকটা আমার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে বলল "চাই নাকি স্যার? এ্যাংলোইণ্ডিয়ান, বাঙালী, পাঞ্জাবী, এমন কি চাইনীজও আছে। অল কলেজ গার্ল স্যার। বিউটিফুল এ্যাণ্ড ইয়াং।"

আমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে, লোকটি একই সুরে বলল "একবার অন্ততঃ দেখে যান স্যার।"

আর চুপ করে ওর কথা শোনাটা ঠিক হবে না ভেবে বললাম, "তার আগে হোটেলটা কোথায় পড়বে, দয়া করে বল দেখি, তারপর তোমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখব।"

লোকটার গলার স্বরটা একমুহূর্তেই বদলে গেল। যে জায়গা থেকে সে এসেছিল সেইখানে ফিরতে ফিরতে রুক্ষস্বরে বলল "আগে বাড়ুন।"

অগত্যা ঐ ফুটপাত ধরেই এগোতে হল। মিনিট দশেক হেঁটে

দুধারের অনেকগুলো হোটেল পার হয়েও, আমার ঈপ্সিত হোটেলটা চোখে পড়ল না। এবং যখন ভাবছি এবার বাড়ী ফিরলেই হয়, তখন দেখি কিছুদূর একটা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রমেন সিগারেট খাচ্ছে আর এদিক তাকাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে, সিগারেটটা রাস্তার মাঝখানে ছুঁড়ে, আমার দিকে এগোতে এগোতে রমেন বলল, "কিরে এত দেরী করলি? সেই আটটা থেকে তোর জন্য হা পিত্তেশ করে দাঁড়িয়ে আছি, তা তোর পাত্তাই নেই। দেরী দেখে ভাবছিলাম তুই বোধহয় আর এলিই না! কিংবা তোর ক্লাবের মালীটা আমার চিঠিটা তোকে দিতে বেমালুম ভুলেই গেছে।"

আমি বললাম "না. না চিঠি আমি তোর ঠিক সময়েই পেয়েছি, কিন্তু বিশ্বাস কর, তোর এই পার্ক স্ট্রীটের হোটেলটাই আমাকে এত দেরী করাল। বাব্বা আচ্ছা একখানা হোটেল খুঁজে বার করেছিস বটে!"

রমেন অবাক হয়ে বলল "সে কীরে, পার্ক স্ট্রীটের এই হোটেলটাই চীনে খাবারের জন্য ভারত-প্রসিদ্ধ।"

আমি রেগে বললাম "রাখ্ তোর চীনে খাবার। এমনি ভাত ডাল যার দুবেলা দুমুঠো জোটে না তার কাছে চীনে খাবার।"

রমেন হেসে বলল "আচ্ছা, আচ্ছা রাখ তোর বিনয়। এখন চল ত তোর সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দিই।"

একতলার সব টেবিলগুলিই ভর্তি। ফিসফিস কথা আর কাঁটা-চামচের টুঙ-টাঙ শব্দের মাঝখান দিয়ে রমেন আমাকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠাল। এককোণে একটা গোলটেবিলে চারটে চেয়ার পাতা টেবিলের উপর গ্লাস, ডিস, ছুরি-কাঁটা অর্থাৎ ডিনারের সরঞ্জাম সব নিপুণ কুশলতায় সাজানো। একটা চেয়ারে এক ভদ্রমহিলা লম্বা এক উঁচু গ্লাসে বিয়ার সিপ্ করছেন। তারই সামনে আমাকে নিয়ে গিয়ে রমেন বলল "ইনি মিসেস ব্যানার্জী ওরফে মীরা পালুশকর। আর মীরা দিস ইজ্ অমল ডাট্। মাই ওল্ড স্কুল-মেট অব্ হুম আই টক্‌ড ইউ সো মাচ্।"

নমস্কার এবং কুশল বিনিময়ের পর রমেনকে ঠাট্টা করে বললাম, "কিরে কবে বিয়ে করলি সেটা ত জানালি না। গত বছর বোম্বাইতেও ত দেখা হল তখনও ত পরিণয়ের কোন লক্ষণ তোর কথাবার্তায় আবিষ্কার করিনি।"

রমেন লাজুক হেসে বলল, "নারে, বিয়েটা কেমন যেন হঠাৎ হয়ে গেল। যাকগে সে লঙ স্টোরি পরে শুনলেও চলবে। আপাততঃ তোকে কি ড্রিংক্‌স্‌ দেবে? স্কচ না শেরী?"

আমি বললাম, "প্রথমতঃ আমি ও রসে বঞ্চিত। তার ওপর এত বোকা নই যে জল খেয়ে পেট ভর্তি করব।"

এবার মীরা হেসে বলল "না, না অমলবাবু, আপনাকে আমরা মোটেই ঠকাব না। আমরা অপেক্ষা করছি, আমার এক বাল্য-সখীর জন্য। কাজেই ও না আসা পর্যন্ত আপনি অন্ততঃ একটা 'অরেঞ্জ স্কোয়াস' নিন। আশা করি এতে আপনার আর আপত্তি হবে না।"

ভদ্রতা করে আমাকেও বলতে হল, "না না, আপত্তি কিসের।" এর পর ওদের বিয়ের এবং পূর্ব রাগের গল্প শুনতে শুনতে কখন আধঘণ্টা কেটে গেছে তা আমরা কেউ লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ মীরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "এসে গেছে"। আমরা দুজন একসঙ্গেই কাঠের সিঁড়ির দিকে ঘাড় ঘোরালাম। মুখটা প্রথমে দেখতে পেলাম না মাথা নীচু করে মেয়েটি উপরে উঠছিল বলে। একরাশ শ্যাম্পু করা চুল পিঠের মাথার দুদিকে ছড়ান। লাল সিফনের শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে পরা ব্লাউজ ও লাল জুতোটা মেয়েটির রূপে ঝলমলিয়ে উঠেছে। সিঁড়ি শেষ করে দোতলার ফ্লোরে মেয়েটি মাথা তুলে দাঁড়াতেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "শকুন্তলা"।

রমেন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, "হ্যাঁ। শকুন্তলা প্যাটেল। চিনিস না কি?"

আমার উত্তর দেবার আগেই মীরা শকুন্তলার হাত ধরে আমাদের

টেবিলের কাছে নিয়ে এল। নিজের অসোয়াস্তি বাঁচাতে আমি শকুন্তলার চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করছি—সে চোখে পূর্ব পরিচয়ের কোন স্বাক্ষর মেলে কি না!

শকুন্তলা কিন্তু নির্বিকার ভাবে জোড় হাত করে ইংরাজীতে বলে উঠল "কিছু মনে করবেন না নিজের প্রগলভতায় আমার নাম শকুন্তলা প্যাটল।"

মীরা আমাদের দুই বন্ধুর পরিচয় ওর কাছে রাখল। আমি ঠিক কি ধরণের আচরণ করব, তাই নিয়ে যখন বিশেষ চিন্তিত তখন রমেন বলল "এবার তাহলে ডিনারের অর্ডারটা দেওয়া যাক। কেননা এমনিতেই আমাদের যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে।"

শকুন্তলা, মীরার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলতেই মীরা আপত্তি করে উঠল "না, না তা কি করে হয়। এখনই আমরা তোকে ছেড়ে দিতে পারি না। তার চেয়ে তুই তোর বয়-ফ্রেণ্ডকে এখানেই ডাক না, আমাদের দিক থেকে এতে কোন আপত্তি নেই। বরঞ্চ আমরা খসীই হব।"

শকুন্তলা মৃদু হেসে বলল "ও নেই। আমাকে ড্রপ করেই কোথায় যেন গেছে। মিনিট পনেরো পরে আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। পোদ্দারের ওখানে পার্টি আছে।"

মীরা আর কিছু বলল না। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে রমেনের দিকে তাকাল। রমেন একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল "দেখুন মিসেস প্যাটেল, একটা কিছু না খেলে আমাদের দুজনের মনেই লাগবে। আমাদের বিয়ের সময় আমরা আপনাকে গরু খোঁজা খুঁজেছিলাম। আপনার বাবার কাছ থেকে জানতে পারলাম আপনি তখন লণ্ডনে। যাই হোক এখানে এখন আমাদের সঙ্গে ডিনার না করুন, একটা কিছু সফ্‌ট-ড্রিঙ্ক ত নিন।"

শকুন্তলা রমেনের কথা শুনে ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলল "সফ্‌ট্ ড্রিঙ্কে আমার রুচি নেই মশাই। স্কচের অর্ডার দিন।

রমেন থতমত খেয়ে বলল "নিশ্চয়, নিশ্চয়। উইথ প্লেজার।"

ডিনার যখন মধ্যপথে, নানান্ ধরণের গল্পে এবং হাসিতে আমরা তিনজনই যখন উজ্জিয়ে উঠেছি, ড্রিঙ্কস হাতে শকুন্তলা তখন নীরব। মাঝে মাঝে খালি আমাদের কথায় ভদ্রতা করে সায় দিয়ে বলেছে— —"ইজ দ্যাট শো অথবা ইজ ইট!"

ছু'পেগ হুইস্কি ততক্ষণে নিঃশেষ করেছে শকুন্তলা। এমন সময় বয় এসে ওর কানে চুপিচুপি কি বলতেই, শকুন্তলা দাঁড়িয়ে উঠে বলল "এবার আমি চলি মীরা। রমেনবাবু, ড্রিঙ্কসের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে আপনাদের মিলিত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করি।"

শকুন্তলাকে এখন একটু কেমন যেন অপ্রতিস্থ লাগল। চোখের তারা ছুটো কেমন যেন অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে। মীরা শকুন্তলার ডান হাতটা নিজের ছুহাতে নিয়ে চাপা গলায় বলল, "শকুন্তলা, আগের তুলনায় এখন তোকে অনেক বেশী সুন্দর দেখতে হয়েছে তা স্বীকার করি, কিন্তু এদেশে মেয়েদের এত ফাস্ট লাইফ মানায় নারে।"

শকুন্তলা নিরুত্তর। শুধু নিজের হাতটা মীরার হাত থেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। ওর পিঠের অনেকটা নগ্ন সাদার সঙ্গে লাল রঙের ব্লাউজের দিকে আমরা তিনজনেই চেয়ে রইলাম।

ডিনারের শেষ আইটেম পুডিঙের উপর চামচ চালাতে চালাতে রমেন প্রশ্ন করল "শকুন্তলার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হোল ও তোকে ইচ্ছে করেই ইগনোর করল অর্থাৎ তোর সঙ্গে ওর পরিচয় আছে।"

আমার তখন খাওয়া হয়ে গেছে। টুথপীক্ দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললাম, "অন্ততঃ আজকের এই শকুন্তলা প্যাটলের সঙ্গে নয় সে ছিল শকুন্তলা দেশাই-এর সঙ্গে। যাকে শুধু আমি নয়, আমার টিমের ষোলো জন প্লেয়ারই ডাকত 'বহেন' বলে।"

মীরা আমার কথায় সায় দিয়ে বলল, "বোম্বেতে বিশেষ করে,

কুপারেজে ওকেতো সবাই একডাকেই চেনে। একটা সময় ও রাত দিন খেলার মাঠ আর খেলোয়াড়দের নিয়েই মেতে থাকত। আমরা ওর বন্ধুরা কতদিন ওকে ঠাট্টা করেছি এ নিয়ে, ও কিন্তু গায়েই মাখে নি। তখন কত শান্ত আর লাজুকই না ছিল এই শকুন্তলা।"

এবার আমি মীরার দিকে চেয়ে বললাম, "কিছু মনে করবেন না, সেই খেলোয়াড়ী জীবন থেকে আজকের কোচের জীবনে বহুবার আমাকে আপনাদের বোম্বাই যেতে হয়েছে এবং এক একবার ত মাসখানেক পর্যন্ত থাকতেও হয়েছে। কিন্তু কোনবারই আমার বোম্বাই ভাল লাগেনি। প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে পালাই পালাই। আমি যে ঘড়কুনো বাঙালী সে অপবাদ অবশ্যই আপনি আমাকে দিতে পারবেন না। কেননা পৃথিবীর নানান্ দেশে, আমি দীর্ঘকাল নানান্‌ভাবে কাটিয়ে এসেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই বোম্বাইতে গেলেই আজও আমার কেমন যেন নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্গ লাগে।"

মীরা প্রতিবাদের সুরে বলল, "কেন সুন্দর করে সাজানো সমুদ্রের তীর, ঝকঝকে তকতকে রাস্তা, সাজানো ছবির মত বড় বড় বাড়ী এসব দেখতে আপনার ভাল লাগে না ?"

রমেন এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ছিল। কিন্তু মীরার কথার প্রতিবাদে এবার বলল, 'ওসব কিছুই ত সাত দিনে শেষ হয়ে যায় মীরা। তারপর মানুষ খুঁজে বেড়ায় মানুষকে।"

মীরা ঠাট্টা করে বলল, "তাই বুঝি বোম্বেতে মানুষ না পেয়ে, আমাকে খুঁজে বার করতে পুনায় ছুটতে হল ?"

রমেন গম্ভীর হয়ে বলল, 'রনে আর প্রেমে ও দূরত্বটা কিছুই নয়। কিন্তু অমলকে বলতে দাও। ওকে ডিসটার্ব কোর না প্লীজ।"

"সালটা বোধহয় ১৯৬০-ই হবে। আমাদের ক্লাব সেবার রোভার্স কাপ খেলতে বোম্বাই যাবে না এটাই ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিঃ জিয়াউদ্দীনের বিশেষ অনুরোধে আমাদের বোম্বাই যেতেই হল। প্রথম দিন সকালবেলা মাঠ থেকে প্র্যাকটীশ করে হোটেলে ফিরে

দেখি অতীতের আমার সহ-খেলোয়াড় অলিম্পিয়ান প্যাপেন লাউঞ্জে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ঘরের বাইরে আমাকে বার করে নিয়ে এসে বলল, 'অমল, একটি মেয়েকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে তার যেন বিশেষ কি দরকার আছে। এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে কি তার আলাপ করিয়ে দেব, না তুমি স্নান-টান সেরে এলে?'

আমি বললাম 'এই হাফ-প্যাণ্ট পরা, কাদা মাখা গায়ে কোনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে কি পরিচিত হওয়া যায়? তুমি বরং পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি এর ভিতরই ড্রেস চেন্‌জ করে আসছি।'

মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েই প্যাপেন আর দাঁড়াল না। বলল, 'অমল, কিছু মনে কোরো না, আমার অফিস এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে, আর দেরী করলে চাকরীটাই হারাব। তোমার সঙ্গে বিকেলে মাঠে দেখা করব?'

এবার আমি শকুন্তলা দেশাইয়ের দিকে তাকালাম। সাধারণ কাপড়ের সাদা স্কার্ট পরণে। বাঁ হাতে ছোট্ট একটি ঘড়ি। কানে দুটো হীরের টব। ব্যাস, সারা শরীরে আর কোন অলঙ্কারের চিহ্নও নেই। আমার একটু বিস্ময় লাগল এই সাধারণ পোশাক দেখে। কেননা প্যাপেন বলে গেল ও এক বিরাট কাপড়ের মিলের ম্যানেজারের মেয়ে।

আমি ইংরাজীতে বললাম "বলুন ম্যাডাম, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

পরিস্কার বাঙলায় শকুন্তলা উত্তর দিল 'গতকাল রাত্রে মিঃ সেন আমাকে ট্রাঙ্ক-কলে জানিয়েছেন যে, আপনাদের হাতে উনি রবীন্দ্র-নাথের বইগুলো আর সুচিত্রা, কনিকা ও দেবব্রতর নতুন রেকর্ড-গুলোও পাঠিয়েছেন। আপনার কাছে কি সেগুলো আছে? থাকলে দিতে পারেন, আমি ওগুলো এখুনি নিয়ে যাব।'

আমি বললাম 'দেখুন, আমার কাছে ওগুলো নেই। আপনি

বসুন, আমি আমাদের ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে আসি ওর কাছে ওগুলো আছে কি না।'

উপর থেকে রেকর্ড আর বইগুলো ওর হাতে দিতে দিতে আমি আর আমার ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনি গুজরাটি হয়ে, এত সুন্দর বাংলা শিখলেন কি করে?

শকুন্তলা হেসে বলল, 'শিখলাম আর কোথায়! বাংলায় পরীক্ষা দেব বলে কলকাতা থেকে বইগুলো আনিয়েছি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু রেকর্ডগুলোও ত আছে। সেগুলো নিশ্চয় আপনার পরীক্ষায় লাগবে না। তা ছাড়া লিখে পরীক্ষা দেওয়া আর এ্যাক্‌সেন্ট নিখুঁত করা এক ব্যাপার নয়।'

শকুন্তলা আগের আড়ষ্টভাব কিছুটা এবার কাটিয়ে ফেলেছে বলে মনে হল। বলল, 'একটু আগে যে মিঃ সেনের কথা আপনাকে বললাম তিনি হলেন আমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু। ওনাদের বাড়ী কুমারটুলীতে। ছোটবেলা থেকেই আমি কলকাতায় ওদের বাড়ী গেলে ওনারা আমায় ছাড়তে চাইতেন না। ওদের বাড়ীতে কোন মেয়ে নেই তাই বোধহয়। এখন ত আমি প্রায় ওদের বাড়ীর মেয়েই হয়ে গেছি। একবার ওখানে গেলে তিন চার মাসের আগে আর ছাড়া পাই না। ওদের বাড়ীর সকলেই আবার ফুটবল পাগল। ওদের সঙ্গে রোজ রোজ গড়ের মাঠে গিয়ে এমন নেশা ধরে গেছে যে এই বোম্বেতে এসেও একবার বিকেলে মাঠে না গেলে মন খুঁত খুঁত করে। বাবা, মা তো রোজ আমায় ঠাট্টা করে বলেন—গান, ফুটবল আর রসগোল্লা, এই তিনটি বাঙালী কালচারই আমার মাথাটি খেল। আপনি কি বলেন!' বলে শকুন্তলা হাসিতে ফেটে পড়ল।'

আস্তে আস্তে শকুন্তলা শুধু যে আমারই 'বহেন' তাই নয়, সারা টিমটার সকল ফুটবলাররাই ওকে 'বহেন' বলে ডাকতে সুরু করে দিল। রোজ সকালে বাড়ী থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে ও এসে উঠত

আমাদের হোটেলে, আর বাড়ী ফিরত সেই রাত নটায়। আমিই একটা ট্যাক্সি ডেকে ওকে তাড়া দিয়ে বলতাম 'বহেন, তোমার এবার বাড়ী যাবার সময় হয়েছে।' কোচ হিসেবে, আমি ক্যাম্পে এরপর আর কোন মেয়েকে থাকতে দিতে রাজী নই। আমার এই অঘোষিত নীতিটা ও বোধহয় মনে মনে বুঝতে পেরেই হেসে উত্তর দিত— 'আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

ওখানে থাকাকালীন সেবার ভাইফোঁটা পড়ল। একঘেয়েমি কাটাতে একদিন ঠাট্টা করে বললাম, 'বহেন, তোমার এতগুলো ভাই এতদিন ধরে ঘর ছাড়া আর তুমি তাদের একটি মাত্র বোন হয়েও এদের ভাই-ফোঁটা দিতে পারবে না ?

শকুন্তলা কিন্তু কিন্তু করে বলল, 'দাদা আমার দ্বারা কি হবে ?' আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, 'এখানে ভালবাসাটাই আসল অনুষ্ঠানের ত্রুটিটা গৌণ।'

পরের দিনই ভাইফোঁটা। শকুন্তলা সকাল বেলায় এল স্নান সেরে এলো চুলে। সাদা রঙের ফুলতোলা এক সাধারণ তাঁতের শাড়ী পড়ে। সঙ্গে ওর বোনঝি শীলা। শকুন্তলা সবাইকে এক এক করে ফোঁটা ত দিলই সঙ্গে ছিল ওর বাবার মিলের একখানা করে সুপারফাইন ধুতি, আর সকলের জন্য এক টিন রসগোল্লা। তাতে প্রায় শ চার-পাঁচ রসগোল্লা ভাসছে। সেটা শেষ করতে আমাদের অবশ্য মিনিট পাঁচেকের বেশী লাগল না কিন্তু যেটা কিছুতেই আমরা শেষ বা পরিমাপ করতে পারলাম না সেটি হোল ওর হৃদয়ের শান্ত ও নিরুদ্বেগ ভালবাসা। সেই একবার মাত্র মনে হয়েছিল একটা মানুষ অনেকগুলো মানুষের ধারণাকে অনায়াসে উল্টে দিতে পারে। সেবার একমাসের কাছাকাছি বোম্বাইতে থাকাটা কোথা দিয়ে যে কেটে গেল তা আমরা কেউই খেয়াল করতে পারলাম না।

ফাইনালের আগের রাতে, একটা ট্যাক্সি ডেকেছি শকুন্তলার

জন্য। শকুন্তলা ট্যাক্সিতে উঠে আমাকে বলল, 'আজকের রাতটা একটু বেশী হয়ে গেছে আমাকে একটু বাড়ীতে পৌঁছে দিন না দাদা।'

আমাদের হোটেল থেকে ট্যাক্সিতে ওদের ফ্ল্যাটে পৌঁছতে মিনিট দশেক লাগল। ভিক্টোরিয়া স্টেশনের পাশেই তিনতলার উপরে ওদের বিরাট ফ্ল্যাটটা। ভেবেছিলাম ওকে পৌঁছে দিয়েই ওই ট্যাক্সিতেই আমি আমার হোটেলে ফিরব। কিন্তু শকুন্তলা তা হতে দিল না। জোর করে আমায় তার ঘরে ধরে নিয়ে গেল। আশা করেছিলাম, এরপরে ওর বাবা এবং মার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু তা হতে না দেখে আমি প্রশ্ন করলাম 'কি ব্যাপার শকুন্তলা, এত রাত হোল, তোমাদের ফ্ল্যাটে কারও সাড়া পাচ্ছি না কেন?' শকুন্তলা বলল, 'বাবা, মা সব পার্টিতে গেছেন। ফিরতে রাত একটা কি দুটো হবে।'

'তুমি গেলে না?'

'আমার ওসব ভাল লাগে না।'

'বহেন, আজ তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অবশ্য তুমি যদি পারমিশান দাও।' শকুন্তলা একটা শোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'করুন। পারমিশান দিলাম'।

'তোমার এই বাংলা প্রীতিটা নেহাত বাংলা শেখবার হুজুগেই সীমাবদ্ধ নয় বলেই আমার মনে হয়।'

এ ধরণের প্রশ্ন ও বোধহয় আমার কাছ থেকে আশা করেনি। মাথাটা নীচু করে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল আপনমনে। ও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল 'দাদা, আপনাকে আমার জীবনের এক গভীর সমস্যা-সমাধানের ভার দেব আজ। কিছুদিন ধরেই এ চেষ্টাটা করছিলাম, কিন্তু লজ্জায় সেটা আর মুখফুটে আপনাকে বলতে পারছিলাম না। কিন্তু আপনি আজ যেচে প্রশ্ন করাতে ব্যাপারটা আমার কাছে সহজ হয়ে গেল।

আমার জীবনে কোন একটি ছেলেকে প্রথম ভাল লাগে বছর তিনেক আগে দিল্লীর ডুরাণ্ড মাঠে। পাত্র-অলক। ফুটবলার অলক চ্যাটার্জী। চেনেন নিশ্চয়?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম 'চিনি। মৌখিক পরিচয়ও আছে তবে তার বেশী কিছু নয়।'

শকুন্তলা বলল: কলকাতায় ওর খেলা মেম্বারশীপ গ্যালরীতে বসে এর আগে অনেকবার দেখেছি। কোনদিন ভাবিনি ওর ভেতর এত যাদু আছে। সেবার দিল্লীর মাঠে ওর মাথায় লাগল ভীষণ চোট। খেলতে ত ও শেষ পর্যন্ত পারলই না তার ওপর কনফাসনে সারা রাত ভুল বকে চলল। ওরা তখন উঠেছিল সওদারজঙ-এয়ারফোর্স ক্যাম্পে। আমার পিসতুতো ভাইকে নিয়ে ওকে দেখতে গিয়েই আলাপটা ক্রমশ ভাল লাগায় রূপ নিল। ভারি সুন্দর কথা বলত অলক! রবীন্দ্রনাথের অনেক গানও আমাকে শুনিয়েছিল। গানের গলা অবশ্য ওর তেমন ভাল ছিল না। সেই মুহূর্তে মনে হত এন্‌চান্‌টিং। দুবছরের মধ্যেই আমরা এত কাছের হয়ে উঠলাম যে অল্পদিনের অদর্শনও দারুন অসহ্য মনে হতে লাগল। এমনি এক সময়ে ও দিন দুয়েকের ছুটিতে বোম্বাই এল। আর প্রথম সাক্ষাতেই বলল, 'শকুন্তলা, আমাদের অপেক্ষা করার দিন ফুরিয়েছে। তুমি প্রস্তুত হয়ে কলকাতায় চলে এস, আমি আর থাকতে পারছি না।'

অলকের ফেরার পরদিনই আমি কলকাতা মেল ধরলাম। দুদিনের ঐ দীর্ঘ পথটা মনে মনে আমি যে কত রকমের ইন্দ্রধনু গড়েছি, আবার পরমুহূর্তেই বিচ্ছেদের বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছি তা তোমায় বোঝাতে পারব না। হাওড়া-স্টেশনে পৌঁছেই দেখি আমার কম্পার্টমেন্টের সামনেই বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বোম্বাই ছাড়বার সময়, ছোট্ট একটা চিঠি রেখে এসেছিলাম আমার পড়ার টেবিলে। সেটা পেয়েই বাবা প্লেনে কলকাতা চলে এসেছেন। বাবা আমাকে স্টেশনে কিছু বললেন না। শুধু আমার ডান হাতটা শক্ত করে ধরে

স্টেশনের পাশেই এক হোটেলে তুললেন। তখন গঙ্গার ওধার থেকে পূবের সূর্য সবে উঁকি মারছে। হাওড়া-ব্রীজের তলাটায় পাইপ দিয়ে জল ছড়াচ্ছে কর্পোরেশনের লোকেরা। বাবার গম্ভীর গলাটাও তখন যেন কত শান্ত আর নম্র হয়ে উঠেছে।

বাবা বললেন, 'ছেলেটির পুরোনাম আর ঠিকানাটা দাও। ঘর ছাড়বার আগে আমাকে একবার বললে পারতে। আমি অন্ততঃ তোমাকে বাধা দিতাম না।'

বাবার সেই কথায় আমার ভিতর হঠাৎ যেন একটা কান্নার জোয়ার উথলে উঠল। আমি কিছু বলতে পারলাম না।

শুধু একটা কাগজে অলকের নাম আর ঠিকানাটা লিখে দিলাম। বাবা ব্রেকফাষ্ট না করেই বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমার ঘরে তালাচাবি মেরে গেলেন কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি এক অসহ্য সুখে এই অন্যায়ের প্রতিবাদও করিনি। তারপর সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। বাবার আর দেখা নেই। উনি যখন আমার ঘরের তালা খুললেন তখন গভীর রাত। বাবার সারা মুখটা আবির মাখানো। বুঝলাম বাবা ড্রিঙ্ক করেছেন। ড্রিঙ্ক করলে ওনার মুখটা ঐ রকম লাল হয়ে ওঠে। টাই আর কোটটা একটা চেয়ারে ছুঁড়ে দিয়ে তিক্তস্বরে বললেন, 'এতদিন জানতাম, তুমি ভদ্রলোকের ছেলেদের সঙ্গেই মেলামেশা কর। কিন্তু আজ যার কাছে তুমি পাঠিয়েছিলে সে ত লোফার আর স্কাউনড্রেল ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে, তাজা কোনও গাছকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছ দাদা, আমার অবস্থাটা তখন ঠিক সেই রকমই।'

শকুন্তলাকে কিছুক্ষণ নীরব দেখে, আমি এবার ঔৎসুক্যের স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অলক কি বলেছিল তোমার বাবাকে?'

'অলক প্রথমেই আমাদের ভালবাসার ব্যাপারটাই অস্বীকার করেছিল। তারপর বলেছিল' 'আমার মত সাধারণ মেয়ের কোন

যোগ্যতাই নেই তার মত ছেলেকে বিয়ে করবার। সবচেয়ে বাবার মনে আঘাত লেগেছিল, যখন অলক বাবাকে বলেছিল 'আপনার মেয়েকে উদ্ধার করতে পারি যদি একলাখ টাকার ডাউরি দেন।'

বোম্বের পথে হাওড়া থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ল তখন বাবা খালি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন 'আমি কি ভুল করলাম শকুলা?'

তারপর কেমন করে বোম্বাই ফিরে এলাম আজও জানি না। এরপর ছমাস বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। সংসারের কারও সঙ্গে সেই ছমাস একটা কথাও বলতে পারিনি। ছমাসের পর যখন আস্তে আস্তে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি বাবা তখন আমাদেরই স্বজাতির দুটি ছেলের সঙ্গে আমার এবং আমার ছোট বোনের বিয়ের প্রস্তাব করলেন। দুজনেই প্রচণ্ড ধনী ব্যবসাদারের ছেলে। আমি বাবার সে প্রস্তাবকে এক কথায় নাকচ্ করে দিয়ে বললাম, 'আপনি অনসূয়ারই বিয়ে দিন আমি বিয়ে করতে পারব না।'

বাবা আর জোর করেন নি। শুধু মা সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিলেন। অনসূয়ার বিয়ে হয়ে গেল বেশ ধূমধামের সঙ্গেই। আর তারপর থেকেই কেন জানিনা বাবাও আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন।

জানো দাদা, এ সাগরে অনেক জল কিন্তু সব নোনা। তৃষ্ণা মেটাবার মিঠে জল এ সংসারেএকটুও নেই। আসলে আমি এখন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।'

এবার আমি অবাক হয়ে শকুন্তলার মুখের দিকে চেয়ে বললাম 'এরকম ভাবে তুমি কতদিন আছ?'

ও নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল 'তা বছর খানেকের ওপর।'

'এটাই কি তোমার সমস্যা?'

শকুন্তলা মাথা নেড়ে বলল 'না। নির্জনতা বা নিঃসঙ্গতা এখন আর আমাকে আঘাত করে না। সারা দিনের বেলাটা পড়ি বাংলা সাহিত্য। বিকেল হলে যাই খেলার মাঠে। মাঠ থেকে ফিরে

রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে আমি চুপটি করে অন্ধকারে শুয়ে থাকি।'

ওকে থামতে দেখে প্রশ্ন করলাম, 'তবে তোমার সমস্যা কি শকুন্তলা?'

ও বলল, আমাদের ফ্যাক্টারীর একটা টিম আছে যেটা হারউড লীগ খেলে এবং রোভার্স কাপেও খেলে। এ বছর ঐ টিমটা ষ্ট্রং করবার জন্য তিন চারজন ভাল ফুটবলার রিক্রুট করা হয়েছে। ওরই ভিতর একজন-ভাস্কর রায়চৌধুরী। তুমি ওর খেলা এবার দেখেছ রোভার্সে। সেনটার ফরোয়ার্ডে বেশ ভালই খেলে। ও কিন্তু দিল্লীর ছেলে। দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্স নিয়ে এম, এ পড়ছিল। ওর সঙ্গে আমার আলাপ মাস তিনেকের মত। ও দারুন রিসার্ভড ও গম্ভীর। অলক ও আমার ব্যাপারটা ওকে আমি খুলেই বলেছি। সব শুনে ও খালি বলেছে—'শকুন্তলা, তুমি নিজে ক্লীন থাকলেই হল।'

অলকের কাছ থেকে আঘাত খেয়ে ভেবেছিলাম আমার জীবনে বসন্তের দিন বুঝি চিরকালের মত হারিয়ে গেল। জীবনটাকে বুঝি ছ্যাকরা গাড়ীর মত স্রেফ টানতে টানতে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ভাস্করের সঙ্গ পাবার পর থেকে মনে হল আমার যা কিছু ছিল, তার এক বিন্দুও হারায়নি।'

'ভাস্কর কি তোমাকে বিয়ের কথা কিছু বলেছে?'

শকুন্তলা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না। ভাস্কর সে ধরণের হাল্কা ছেলেই নয়। ওর চরিত্রে এত গভীরতা যে ওর কাছে কিছুক্ষণ থাকলেই মনে হয় ও বুঝি আমার চির আশ্রয়। এদিকে আমাদের মেলা-মেশা নিয়ে আবার কথা উঠল। বাবা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'ভাস্কর সম্পর্কে, আমি অলরেডি কর্মচারী পাঠিয়ে খবর আনিয়েছি। দিল্লীতে গীতা বলে একটি বাঙ্গালী মেয়ে ওর বাগ্‌দত্তা। তবে তুমি যদি রাজী থাক তাহলে তোমার সঙ্গে ভাস্করের বিয়েটা সেট্‌ল

করি। আমার মনে হয় এ বিয়েতে ভাস্করের আপত্তি হবে না।
তাছাড়া ছেলেটি লেখাপড়া আর খেলাধুলোতেও চৌকস'।

বাবাকে সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারিনি। অলকের প্রত্যাখানে সেবারে যেমন বুকছেঁড়া কান্না অনুভব করেছিলাম—এবার কিন্তু তেমনটি ঘটল না। খালি একটা তিক্ত হাসি আমি আমার ভাগ্য-দেবতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বাবার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। এবার আপনিই বলুন আমার এখন কি করা উচিত।'

সে গভীর রাতে শকুন্তলার মুখোমুখি বসে আমিও এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারিনি। শুধু ওকে আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম যে, বোম্বাই ছাড়বার সময় ষ্টেশনে ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।'

শকুন্তলার জন্য ট্রেন ছাড়ার শেষ মুহূর্তেও প্ল্যাটফর্মে ওকে খুঁজে বেরিয়েছি। কিন্তু ও আসেনি। তারপর থেকে শকুন্তলার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। তবে হ্যাঁ, এর মাস ছয়েক পরে, ওর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম।"

রমেন প্রশ্ন করল "কি লেখা ছিল সে চিঠিতে?"

আমি বললাম : শকুন্তলা চিঠিটা লিখেছিল এক ফরাসী জাহাজ থেকে। তাতে লেখা ছিল :

দাদা,

এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে, তখন আমি আর ভারতের মাটিতে নেই। ফ্রেঞ্চ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী—জিবুটিতে। ওখানে আমার এক মাসীমা থাকেন। নিঃসন্তান। ইচ্ছা আছে কোন-দিনই আর তোমাদের দেশে ফিরব না। যেদিন তোমরা বোম্বাই ছাড়লে সেদিন ষ্টেশনে ঠিকই গিয়েছিলাম, কিন্তু ওখানে যখন পৌছলাম তখন তোমাদের ট্রেনটা ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল পার হচ্ছে। বিশ্বাস কর সেই দেরী আমার ইচ্ছাকৃত ছিল না। আমার বোনঝি শীলাকে মনে পড়ে? যে তোমাদের ভাইফোটার সময় আমার সঙ্গে ছিল; ও সেইদিন ভোররাত্রে সুইসাইড় করল। আসলে ও আমার

এক পিসতুতো বোনের মেয়ে। ওদের বাড়ীর অবস্থা ভাল নয় বলে আমাদের বাড়ীতে থেকেই পড়াশোনা করত। বেচারী ভালবেসেছিল এক মাদ্রাজী ডাক্তারকে। কিন্তু ওর বাবা-মার ছিল এ বিয়েতে ভীষণ আপত্তি কিন্তু হতভাগী যে আত্মহত্যা করবে তা ঘুনাক্ষরেও আমায় বলেনি। অথচ আমিই ছিলাম ওর একমাত্র বন্ধু। হাসপাতাল থেকে লাশ বার করে মর্গে না পাঠিয়ে, সোজা শ্মশানঘাটে লাশকে নিয়ে যেতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাই কথা দিয়েও তোমার সঙ্গে আর দেখা হোল না।

শুনলে খুসী হবে, তোমার কাছে যে প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম তা আমি নিজেই সমাধান করে ফেলেছি। একদিন আমি আমার ঘরের ড্রেসিং টেবিলটার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার প্রতিচ্ছায়াকে খুঁটিয়ে দেখছি হঠাৎ মনে হল সেই প্রতিচ্ছায়াটা যেন বলছে, শকুন্তলা এখন কিছু কোরোনা যাতে তোমার মতই আর একটি মেয়ের জীবন জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সেইরাতেই ভাস্করকে মুক্তি দিলাম।

দাদা, এখন আমি সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসছি আর মনে মনে বলছি আমি মুক্ত, আমি মুক্ত।

তুমি আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম নিও।

ইতি—

বহিন শকুন্তলা।

সেই গভীর রাত্রে, আমরা তিনজন হোটেল থেকে বেড়িয়ে ট্যাক্সির আশায় এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। ওরা যাবে বালিগঞ্জ। আমি জোড়াসাঁকো। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মীরা প্রশ্ন করল, "আপনি বোধহয় এর পরের ব্যাপারটা আর জানেন না?"

আমি ঘাড় নাড়লাম।

মীরা বলল, "ওর মাসী জিবুটিতেই ওর এক দূর সম্পর্কের দেওরের ছেলের সঙ্গে শকুন্তলার বিয়ে দিয়ে দেয়। পাত্রের নাম রঞ্জন দেশাই।

সারা পৃথিবীতেই ওদের নানান্ ধরণের ব্যবসা ছড়ান। প্রথম বৌটি রঞ্জনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ডিভোর্স করে চলে যায়। শকুন্তলা ওর দ্বিতীয় স্ত্রী। আজও ভাবতে অবাক লাগে শকুন্তলার মত মেয়ে জেনে শুনে কি করে ঐ ধরণের ছেলেকে বিয়ে করল। বোম্বেতে যখন ওরা বিয়ের পর এল তখন সে পার্টিতে শকুন্তলার বাবাকে বলতে শুনেছি যে এ বিয়েতে তার মত ছিল না। আসলে একেই হয়ত লোকে বলে ভাগ্য।"

সেদিন ভাত খেয়েই তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছি স্ত্রী বললেন, "বাবোটার ডাকে একটা চিঠি এসেছে এনে দেব ?"

তাড়াতাড়ি ছিল। মোজাটা পায়ে গলাতে গলাতে জিজ্ঞাসা করলাম "কে লিখেছে ? তেমন জরুরী নাকি ?"

স্ত্রী ঠোঁট উল্টে বললেন, "তা জানব কেমন করে ? আমি কি খুলে পড়েছি ? তবে চিঠিটা লিখেছে শকুন্তলা দেশাই নামে একটি মেয়ে।" শকুন্তলার নাম শুনে বললাম, 'নিয়ে এস।'

স্ত্রী চিঠিটা আমার হাতে দিতে খাম খুলে দেখি শকুন্তলা আমাকে বাংলাতেই চিঠিটা লিখেছে। ও যে বাংলা ভাষা আজও ভোলেনি তা জেনে বেশ ভাল লাগল।

দাদা,

সেদিন হোটেলে তোমাকে চিনতে পারিনি বা চাইনি বলে, তুমি যদি আমার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করে থাক তাহলে তুমি নিজেই ঠকবে। মানুষ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট লাইন আর যেই টানুক তুমি অন্ততঃ টেনো না।

তাছাড়া, আমার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, ভাইবোন সকলেই তো এই ফাস্ট লাইন চায়। ছোটবেলা থেকে আমি তাদের কবল থেকে পিছলে বেড়িয়ে গিয়েছিলাম বলে তারা যে দুঃখ পেয়েছিলেন তার দ্বিগুন আনন্দ আর গর্ব বোধ করেন যখন দেখেন আজ আমি দেশ বিদেশের হাই সোসাইটিতে দাবড়ে বেরাচ্ছি।

যে অলক আমার ভালবাসাকে একদিন অপমান করেছিল, আঘাত করেছিল পিতৃপরিচয়কে, তাকে যদি তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখ তাহলে হাসতে হাসতে মরে যাবে। ও এখন কিসের জানি ব্যবসা করছে। আমাদের ফার্মে কিছু অর্ডার পাবার আশায় ও এখন আমার পিছনে জোঁকের মত লেগে আছে। ওকে যদি মদের বদলে···সে কথা থাক। তোমাকে এ সব কথা লিখতে যে আমার লজ্জা করছে তা নয় কাগজের অপব্যয় হবে ভেবেই সে কথা বাদ দিচ্ছি।

দূর অতীতে একদিন তোমায় ঘরে ডেকে এনে আমার সমস্যার সমাধান করে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আর দরকার হয়নি। আজকেরটা কিন্তু আর পারছি না। সারা রাত এপার্টি ওপার্টিতে হৈ-হল্লা করে এসে যখন আয়নার সামনে দাঁড়াই তখন আমার ছায়া আর আগেকার মত আমার সঙ্গে কোন কথাই বলে না। আমার অন্তরের যে সত্তাটা প্রচণ্ড একাকীত্বের মাঝেও আমাকে সঙ্গ দিত তাকে আর খুঁজে পাই না বলে একা থাকতে আজকাল যে ভয় করে তা তোমায় আর কি বলব। ঘুমের ট্যাবলেট ছাড়া সে সময় আমার আর কোন সঙ্গী থাকে না। জানা আছে নাকি তোমার অন্য কোন ওষুধ?

ইতি—শকুন্তলা।

তোমার পতাকা

তিনসুকিয়ার এ ট্রেন নাগাল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে যাবে বলে আমরা সকাল থেকেই ভয়ে আর ভাবনায় ছট্‌ফট্ করতে করতে অনেক আগেই স্টেশনে পৌঁছে গেছি।

চীন-ভারত যুদ্ধ সবে থেমে গেলেও ভারতের উত্তর-পূর্বের ঐ দিকটা তখনও থম্‌থমে। এখানে ওখানে দু'চারজন আমাদের মত ছড়ানো ছিটনো যাত্রী ছাড়া গৌহাটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ভারতীয় জওয়ানেতে গিজ্ গিজ্ করছে।

নিজের বেডিংটার ওপরই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। দূরে, প্ল্যাটফর্মের এক কোণায় জটলা দেখে এগিয়ে গেলাম।

২০।২১ বছরের এক জওয়ানকে সবাই মিলে প্রাণপণে চেপে ধরে রয়েছে আর সে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে "মুঝে জানে দো"।

জওয়ানটির চোখ দুটো করমচার মত লাল। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। হাত দুটো মুঠো করা।

একজন বয়স্ক জওয়ানকে ভীড় থেকে একটু তফাতে বিড়ি ধরাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেয়া হুয়া ভাইসাহাব ইয়ে জওয়ানকো"।

ফাঁকা জায়গায় আমায় সরিয়ে নিয়ে নাক মুখ দিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বলল, "বাবু সাহাব ওর নাম হরবংশী। জাতে জাঠ্। আমার পাশের গাঁয়েরই লেড়কা। চার পুরুষ ওরা মিলিটারী। এক মাস আগে বমডিলা থেকে, আমরা চীনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে যখন ভেগে এলাম এদিকে তখন ঐ হরবংশী কিছুতেই আসতে চায়নি। লেকিন্ মিলিটারীতে 'অর্ডার' বাবুজী বড় জবর চীজ্। ওর সেই থেকেই মাথার গণ্ডগোল। তঙ্কা সমেত ওর দুমাহিনা ছুটি মিলেছে, গাঁয়ে গিয়ে শরীর আর মন ভাল করবার জন্য।

কিন্তু ও বলছে যে ও নিজের গাঁয়ে ফিরে ওর বুড়া বাপের কাছে এ মুখ আর দেখাবে না।"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ। ওর বিড়িটা ততক্ষণে শেষ হয়ে এসেছিল। একটা বড় রকমের সুখটান দিয়ে বিড়িটাকে ও রেল লাইনের ওপর ছুঁড়ে দিল।

আমি নীচু গলায় বললাম, "লেকিন ভাইসাহাব যুদ্ধ না করে এইভাবে পেছিয়ে আসার জন্য ত ও দায়ী নয়। তোমাদের মিলিটারীর ওপরতলার অফিসাররা যখন সময় মত অস্ত্র জোগাতে পারেনি, যারা পিছিয়ে আসবার অর্ডার দিল, তাদের ভুলের জন্য ও নিজেকে এত দায়ী ভাবছে কেন?"

জওয়ানটা আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। শুধু চোখদুটোকে পূব দিকে রেল লাইনটা যেখানে দিগন্তের দিকে মিশে গেছে সেই দিকে মেলে দিল। খানিকক্ষণ পরে যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে এমন ভাবে বলল, "বাবুজী" কার গলদ তা আমাদের জানতে নেই। জানলেও বলতে নেই। আমাদের কাম সিরিফ যুদ্ধ করা। বিনা যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়ার যে কী শরম্ তা আপনি সিভিলিয়ান হয়ে ঠিক ধরতে পারবেন না।"

ট্রেনের মৃদু-মন্দ ঝিকির ঝিকির দোলাতেও অন্যবারের মত সেবার সারারাত কি জানি কেন ঘুমোতে পারিনি। ঘুরে ফিরে সেই উন্মাদ জওয়ান হরবংশীর মুখটাই মনে পড়েছে। আর কানে বেজেছে— আমাদের কাম সিরিফ যুদ্ধ করা। বিনা যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়ার কী যে শরম্…কথাটা।

কিন্তু কথাটা মনে হয়েছে যেন বড় চেনা চেনা। কবে কোথায় আমিই যেন এই কথাটাই হাজার বার নিজের মনে আউরেছি।

সিনেমার ফ্লাশ-ব্যাকের মত হঠাৎ মনে পড়ল ১৯৫৪ সালের কথা। সেবার এশিয়ান গেম্সের আসর বসবে ফিলিপাইন্সের রাজধানী ম্যানিলাতে। মাস তিনেক আগে থেকেই আমি আর সনৎ শেঠ

এরিয়ান্স টেন্টে বসে আলোচনা করি, আগামী এই খেলার গুরুত্ব নিয়ে। ১৯৫১ সালে দিল্লীর প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারত যেমন ইরানকে ফাইনালে হারিয়ে এশিয়া-বিজয়ীর আখ্যা লাভ করেছিল তেমনি ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ১০-১ গোলে ভারতের শোচনীয় পরাজয় ভারতীয় ফুটবলারদের মনে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের জমি তৈরী করেছিল। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও সাউথ কোরিয়ার প্রস্তুতির কথা কাগজেও বেরিয়েছিল। সেই তুলনায় আমাদের প্রস্তুতির তো উচ্চ বাচ্যই ছিল না।

রেঙ্গুনে ১৯৫৩ সালের কোয়াড্রাঙ্গুলারের আগে আমরা নিজেদের ভিতর একদিনও অনুশীলনের সুযোগ পাইনি। ভারতীয় দলের কোচও কেউ ছিল না। পুরীর জগন্নাথদেবের রথের মত ভারতীয় ফুটবল যখন নড়ে চড়ে উঠল তখন এশিয়ান গেমসের একমাস মাত্র বাকী।

সি. টি মাঠে ভারতীয় দলের কোচ শ্রীবলাই চ্যাটার্জী চেয়ারে বসে বসে দিন দশেক কোচ করলেন আমাদের মত ৬।৭ জন ভারতীয় দলের নবাগতকে।

সিনিয়ার খেলোয়াড়দের মাঠের ধারে কাছে দেখা গেলনা সে কয়েকদিন। তারপরেই একদিন আমরা আকাশে উড়লাম হংকং এর দিকে। সেখানে তিনটি প্রদর্শনী খেলাই আমাদের খুব নীচু মানের হল।

কর্ম কর্তারা বললেন "কোই বাত্ নেই। আমরা স্টেজে মেরে দেব। আমাদের মান্না, আমেদ, চন্দন সিং আছে, আমাদের রোখে কে?"

ম্যানিলায় প্রথম খেলা জাপানের সঙ্গে। আমরা জিতলাম তিন গোলে। দ্বিতীয় খেলা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে। এক···দুই···তিন··· চার···। আমরা হারলাম পরিষ্কার চার গোলে।

খেলার পর মাথা নীচু করে মাঠ থেকে বেড়িয়ে আসছি। স্লাড-

লাইটের দিন করা আলোগুলোকেও মনে হচ্ছিল অস্পষ্ট ঝাপসা। চারদিক থেকে বিশ্রী মন্তব্য ঝড়ে পড়ছিল আমাদের লক্ষ্য করে মাঠের পাশেই দাঁড়ানো পাকীস্তানী ফুটবলারদের।

কাঁধ ঝুলে পড়েছে আমাদের ক্লান্তিতে, মাথা লজ্জায়। লজ্জা···লজ্জা···লজ্জা···।

ছুটো টিমের ভিতর একটা টীম ত হারবেই। তাই বলে, গত বারের এই টোর্নামেণ্টের বিজয়ী টীম এ রকম আনাড়ীর মত খেলে শোচনীয় ভাবে হারবে?

ষ্টেডিয়াম থেকে আমাদের ক্যাম্প মাইল ছয় সাত দূরে। বাসে আমরা সবাই চুপ। নিথর-নিস্পন্দ। এমন কি আমরা কেউ কারও দিকে তাকাতেও পারছি না। তবুও একটা কথা যেন অনুচ্চারিত হয়ে বাস ময় ঘুর ঘুর করে ঘুড়ে বেরাচ্ছিল—

"এভাবে, বিনা প্রস্তুতিতে বিদেশে ভারতীয় ফুটবল দলের ঐতিহ্যকে ম্লান করে দেবার জন্যে ভারতীয় দলকে পাঠান উচিত হয়নি।"

দমদম এরায়পোর্টে সেবার কাষ্টমস্ চেকিং-এর জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। কাছেই ভারতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা সব হাসি মুখে দাঁড়িয়ে।

আমার তখন প্রবল জ্বর। তার ওপর সারাটা পথ প্রপেলারের পাশের সীটে বসে এসেছি। তাই যন্ত্রনায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

একজন কাষ্টমস অফিসারকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবার অনুরোধ করাতেই, ভদ্রলোক খিঁচিয়ে উঠলেন, "বাগাররা বিদেশে গিয়ে স্ফূর্তি করবে আর যার তার কাছে হারবে, আবার দেশে এসে সব রকম সুবিধা চাইবে।"

পাশের আর এক অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বলল, "চেহারা করেছে দেখ-বদমাইশী করে।"

কথাগুলো যেন আমার বুকের মাঝখানে হাতুড়ীর ঘা হয়ে

বাঞ্জল, দমদম থেকে বাড়ী ফিরবার পথে, সেবার হাজার বার মনে মনে নিজেকেই বলে ছিলাম "খেলায় হেরে গেলে, খেলেয়াড়ের মনে যে আঘাত লাগে বাইরের লোককে তা কিছুতেই বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বিনা প্রস্তুতিতে যারা এ রকম ভাবে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে হারাবার জন্য দায়ী—, যারা ভারতের জাতীয় পতাকা আমাদের হাতে তুলে দেবে, কিন্তু তাকে বইতে দেবার প্রস্তুতির এতটুকু সুযোগও করে দেবে না—তারা সমালোচনার বাইরেই রয়ে যাচ্ছে বারবার।

এর চেয়েও তাদের অপরাধ বড় এইজন্য যে তারা প্রদীপের সলতে পোড়ানোটাই চালিয়ে যেতে চাইছে কোন রকমে। কিন্তু তার আগে সলতে পাকানোর যে পর্বটা তার সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা এবং এর অপ্রোজনীয়তা এর জোর গলাতেই জনসমক্ষে বলে ববাচ্ছে। তারপর থেকে যতবার সেই ভারতীয় ব্লেজার গায়ে দিয়েছি পরাজয়ের গ্লানি আমার বিবেককে বারবার খুঁচিয়েছে।

ব্যাতিক্রম শুধু একবার। ১৯৫৭'র অক্টোবর কি নভেম্বর হবে। লণ্ডনের ফ্লীট্ স্ট্রীট ধরে ঘুরছি ত ঘুরছি। হাতে আমার লণ্ডনস্থ অমৃত বাজার ও যুগান্তরের প্রতিনিধি সুন্দর কাবাডির নামে শত ঘোষের লেখা চিঠি। নম্বর মিলিয়ে পর পর ঠিকানা পাচ্ছি। কিন্তু মাঝের থেকে তার ঠিকানাই বেপাত্তা।

ক্লান্ত হয়ে ফিরব ভাবছি এক ইংরেজ ভদ্রলোক আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তার ঘড়ে বসালেন। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বললেন যে তিনি ওখানকার নামকরা দৈনিক কাগজের একজন স্পোর্টস রিপোর্টার।

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর হঠাৎ ভদ্রলোক আমাকে ধুম করে প্রশ্ন করলেন "লণ্ডনের কোন ক্লাব থেকে কি ডাক পড়েছে নাকি আপনার? আর্সেনিলের ত হাফ ব্যাক নেই। ওখান থেকে কি?"

আমি ভদ্রলোকের কথার উত্তর দেব কী? প্রথম কিছুক্ষণ ভদ্রলোকের মুখের দিকেই স্রেফ চেয়ে রইলাম। তারপর উত্তর দিতে গিয়েও দেখি গলা দিয়ে আমার স্বর বেরোচ্ছে না। তিন চারবার কেসে গলাকে পরিস্কার করে নিয়ে আমতা আমতা করে বললাম, "আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। আমি এদেশে এসেছি কোচ হবার ট্রেনিং নিতে, খেলতে নয়। আর তাছাড়া ভারতীয় ফুটবলের মান এত উঁচু নয় যে আর্সেনিলের মত জগৎ জোড়া পেশাদারী টীম থেকে তার ডাক পড়বে।"

ভদ্রলোক প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে একটি নিজে নিয়ে প্যাকেটটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি মাথা নাড়াতে প্যাকেটটি পকেটস্থ করলেন। সিগারেটটা নিজের বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে ঠুকতে ঠুকতে মুচকি হেসে বললেন:

"নিজেদের এত ছোট ভাবছেন কেন? এবারের মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে ভারতীয় দলে আপনি ছিলেন?"

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম "আমি তখন এখানে!"

উনি বললেন, "আমি ভারতীয় দলের সব খেলাই মেলবোর্ণে দেখেছি। আপনাদের খেলা নিখুঁত একথা বলব না। অনেক কিছু এখনও শেখবার আছে আপনাদের আমাদের কাছে। কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় আশার কথা যে ইয়োরোপীয়ানদের মত সফিস্টিকেটেড হয়ে যায় নি এখনও আপনাদের খেলা। বেশ উদ্ভাবনী শক্তি রয়েছে আপনাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে। অনেকটা ল্যাটিন আমেরিকান ফুটবলারদের মত। দেখবেন আগামী রোম ওলিম্পিকে আপনাদের টীম আরও ভাল খেলবে।"

অবশেষে তিনি নিজেই সঙ্গে করে, সুন্দর কাবাডির অফিসের দোড় গড়ায় আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

একা সেখানে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকে' কথা গুলো রোমন্থন করলাম।

হঠাৎ মনে হল 'তাইতো, ভদ্রলোক জানলেন কেমন করে যে আমি ফুটবল খেলি।

নিজের বেশের দিকে তাকাতেই, আপন মনে হেসে উঠলাম। পরণে আমার সেই এশিয়ান গেমসের ব্লেজার।

এই প্রথম ব্লেজার আমার মনে গৌরবের দোলা লাগাল। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির কণা, আর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়াকে উপেক্ষা করে দ্বিগুন উৎসাহে ব্লেজারের কলার দুটো তুলে দিয়ে পরম আশ্বাসে নিজেকেই যেন নিজে জড়িয়ে ধরলাম।

তারপর অনেক জল গড়িয়েছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, আর শতদ্রু, বিপাশা দিয়ে। সূর্য হেলেছে অনেকবার পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ঋতু করেছে পালা বদল।

সেই ইংরেজ সাংবাদিকের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে রোম ওলিম্পিকে। আর সেই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণ যুগের উপর দাঁড়ি টেনে দিয়েছে ভারতের অদ্বিতীয় কোচ রহিমের মৃত্যু।

মৃত্যু আর জীবন কে কাকে অবলম্বন করে আছে তা জানি না তবে মৃত্যুর পর মানুষের চিতার ওপর মঠ না উঠুক—তার সারা জীবনের প্রদর্শিত পথের দিশারীকে মানুষ যদি ভোলে, তাহলে যা অবস্থা হয়—সেটা আজ ভারতীয় ফুটবলের শোচনীয় পরিণতির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

কিন্তু গৌহাটি ষ্টেশনের ভারতীয় জওয়ানের সেই মর্মন্তুদ আর্তনাদ "লড়াই থেকে পালিয়ে আসার যে ·কী শরম্" আর ১৯৫৪'র আমার সেই সলিলকে "বিনা প্রস্তুতিতে যারা আমাদের বাধ্য করছে ভারতের জাতীয় পতাকা বহন করতে তারা সমালোচনার বাইরেই রয়ে যাচ্ছে বারবার" এত বছর পার হয়েও আজকের ভারতীয় ফুটবলারদের মনে ও মুখে ঘুড়ে বেড়াতে দেখছি কেন? কে তার উত্তর দেবে?